KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : 28, বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় |
| Title : সমকালীন (SAMAKALIN) | Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 C.m. |
| Vol. & Number : ৪/-<br>৪/-<br>৪/-<br>৪/- | Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৫৩<br>আষাঢ়, ১৩৫৩<br>শ্রাবণ ১৩৫৩<br>কার্তিক, ১৩৫৩ |
| | Condition : Brittle / Good |
| Editor : সৌরীন্দ্র নাথ মিত্র,<br>অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় | Remarks : |

| |
|---|
| C.D. Roll No. : KLMLGK |

# সমকালীন


কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ বৈশাখ ১৩৬৩

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ বৈশাখ ১৩৬৩



• শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

# অবনীন্দ্রনাথের চিঠি

আচার্য নন্দলাল বসুকে লিখিত

বুধবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল,

তুমি ইচ্ছা এবং মন সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি পাঠিয়েছ তার একটা উত্তর আমি গতবারে Universityর একটা Lectureএ দেবার চেষ্টা করেছি। 'বঙ্গবাণী' কবে যে ছাপবে তা জানিনা। যাই হোক এই চিঠিতে একটুখানি লিখছি। প্রশ্নটা অল্পে পরিষ্কার হবার নয়।

কাজের মূলে হল মানস এবং ইচ্ছা—সহেতুক এবং অহেতুক। দুটো কথারই মানে এক হলেও ওদের কাজ একটু স্বতন্ত্র রকমের। এক কথায় বলতে বলি—**মানস** ভাবায় আর ইচ্ছা চালায়। মানস কতকটা নিষ্ক্রিয় এবং ইচ্ছা সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল। মানস ধরে বসে থাকে মানুষ অনেকদিন, মানস সফল হবার উপযোগী অবসর ও উপাদানের অপেক্ষায়। যে ভাবে গর্ভে শিশু অপেক্ষা করে সেই ভাবের ক্রিয়া মানসের ইচ্ছা হল বেগ, গতি, বেদনা এ সবের জননী—মানসকে ফোটাবার দিকে নিয়ে চলে সে। বীজ যে ভাবে থাকে মানস সেই ভাবে থাকে, গাছ যে ভাবে বাড়ে ইচ্ছা সেই ভাব ধরে চলে। ইচ্ছার প্রকাশ হল শিকড়, ডালপালা, মানসের প্রকাশ হল ফুল ফল।

তুমি মানস করলে একটা বিশেষ ভাব ও রস ছবি দিয়ে কি কবিতায় ফোটাবে—মনে ধরলো কিছু রূপ, তারপর এল প্রকাশের ইচ্ছা—নানা আঁকা জোঁখা ধরে ইচ্ছা চল্ল বেড়ে—তার পরে শেষ হল গিয়ে ফলে কি ফুলে, কিম্বা ফল-ফুলবিহীন একটুখানি শোভায়—সবুজ রংএ, নীল ছায়ায়।

বীজের মধ্যে গাছের যে মানস ছিল সে ইচ্ছার স্রোত বেয়ে গিয়ে ফুটলো গাছের আগায়। সেইখানে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক হল বীজের মধ্যে ধরা মানসটির। যেমন পদ্মফুল, তার গোড়ায় রইল মানস, মাঝে উঠলো ইচ্ছা ফোটাতে মানস, শেষে রইল

ফুটন্ত মানসটুকু। সেই যে ফুটন্ত মানস তার মাঝে মধু এবং নূতন সৃষ্টির বীজ একসঙ্গে রইল—এই হল শিল্পকাজের ধারা।

তুমি বলছ—আঁকতে আঁকতে দেখ যে যা আঁকতে ইচ্ছা ছিল, তা না হয়ে হল আর একটা। অবশ্য শিব গড়তে গিয়ে বানর হয়ে পড়লে কাজ ঠিক হলনা বলতে পারি। কিন্তু মূল মানস বা ভাবনা যদি ঠিক থাকে তবে মাঝের রাস্তা সোজা না হয়ে যদি নানা আঁক বাঁক পেয়ে চলে তাতে বড় একটা আসে যায় না। সব গাছেরই ইচ্ছা সোজা গিয়ে আগায় ফুল ফল ধরায়। কিন্তু ইচ্ছাপূরণের ফলে চারিদিকে নানা টান নানা ধাক্কা সয়ে চলতে হয় বলে সব গাছ তালগাছ হয়ে ফল ধরায় না—কেউ লতিয়ে যায়, কেউ হেলে পড়ে, কেউ ছড়িয়ে যায়।

ইচ্ছার বেগ যে অবাধ গতি পায়না তাতে করে সৌন্দর্য্য হানি হয়না, বরং বৈচিত্র বাড়ে। এই ইচ্ছাপূরণের বাধা ছন্দের সৃষ্টি করে—তাতে করে একই রস নানা ছন্দে ব্যক্ত হয়ে যায়। গুঁতো দেবার ইচ্ছা কোনো হরিণের মাথা ফুঁড়ে সোজা উঠলো, কারু উঠলো এঁকে বেঁকে, কিন্তু আসল কাজ গোঁতানোর ব্যাঘাৎ হল না। কিন্তু শিং উঠতে উঠতে হয়ে গেল সেটা কান কিম্বা ফোঁড়া মাত্র যখন তখন সেটা ভুল হল বলতে হবে।

মানস এবং ইচ্ছা এর মধ্যে মানস ফোটার বাধা যদি না থাকতো তো ছবি হয়ে যেতো যাদুবিদ্যের কাজ—ফুঃ দিলেম আর ছবি হল—ক্যামেরা কতকটা এইভাবে ছবি লেখে। যেমন ইচ্ছা তেমনটি আঁকা হয়না, বলা হয়না, গাওয়া হয়না। সেই জন্যই বারে বারে নতুন নতুন করে বলার ইচ্ছা জাগে, গাওয়ার ইচ্ছা আসে, আঁকার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হুবহু পূর্ণ হলে রূপকারের বিপদ—তার নিজের খেলা বন্ধ হয়, লীলা সাঙ্গ হয়। যে ভাবে ইচ্ছে করলেই ছবি লিখবো, সে ছবি লেখে না মানসের ফটো ওঠায় মাত্র।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ

সোমেন বসু

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে পুরুষানুক্রমে গায়ত্রীমন্ত্রে তাঁদের দীক্ষা। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। ব্রাহ্মধর্মের পথ ও মত নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে এই গায়ত্রীমন্ত্রের গভীর আবেদন তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। মনের ভিতরে যখন গভীর অতৃপ্তি, যখন ভগবৎ উপলব্ধির আকাঙ্খা মন ভরে আছে তখন গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ তাঁকে বিশ্বাস দিয়েছে। সেই অনন্ত তেজোময় পুরুষ যেমন আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে পরিচালিত করেন তেমনি তাঁকেও পরিচালিত করে এই বোধ ক্রমে ক্রমে তাঁর অন্তরের ভিতর দৃঢ় হতে লাগলো। এই গায়ত্রী মন্ত্র শুধু তাঁর উপাসনার মন্ত্র ছিলনা এই ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি দিদিমার কথা বলেছেন—"কখনো কখনো তিনি সন্ধ্যা করিয়া উদয়াস্ত করিতেন; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময় ছাদের উপর রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম, এবং সেই সূর্য অর্ঘের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল।"

সূর্যবন্দনার মন্ত্রে শিশুচিত্ত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তাই ধর্ম সাধনায় কোন জড়তার বিকৃতি তাঁর বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সেই সুস্থ জীবনদৃষ্টি, সেই সংস্কার মুক্ত সাধনার সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন আরও বেশী করে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ানঃ প্রচোদয়াৎ। মহর্ষির এই উদার উন্মুক্ত জীবনদৃষ্টির পিছনে রয়েছে সেই সবিতা দেবীর আরাধনা, সেই তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ময় আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের উদার প্রশস্তি।

তাঁর ধর্মসাধনার ঐ মন্ত্রটি আশ্চর্যভাবে অনুবর্ত্তিত হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনে। যে প্রশান্ত আকাশ আমাদের জীবনের পটভূমিকা রচনা করে, যে দীপ্তিকেন্দ্র সূর্য আমাদের জীবনে তেজ বিকীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথের সাধনা তার প্রতি বিমুখ ছিলনা। নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জীবনের স্রোতে কোথাও ধ্যানমগ্ন হয়ে থেমে থাকা রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার অঙ্গ ছিল না। মহর্ষির জীবনেও দেখেছি ধর্মবোধ তাঁকে গিরিকন্দরের অন্ধকারে ঠেলে দেয়নি, জীবনের নানা দাক্ষিণ্যকে অগ্রাহ্য করে নিজের চতুর্দিকে ধর্মবৃদ্ধির অভিমানের বেড়া তুলতে দেয়নি। তাই তিনি নিজে বলেছেন, "জলে-তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইবো, বিদেশে বিপদে সংকটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব।"

ঐ গায়ত্রীমন্ত্র, ঐ সূর্য উপাসনার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। অনাদিকাল ধরে যে প্রাণের স্রোত চলেছে তাকে পালন করছে, প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে ঐ সকল প্রাণের প্রাণস্বরূপ আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ। এ সত্য রবীন্দ্রনাথ জীবনে বার বার অনুভব করেছেন, তাই সূর্যবন্দনায় রবীন্দ্রনাথ মুখর। সূর্যকেন্দ্রিক কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সকল মন্ত্রের ভূমিকা রচনা করেছেন তিনি।

মানুষের চতুর্দিকে আনন্দের অবারিত স্রোত চলেছে। যেন আমাদের আনন্দ দেবার জন্যই

সকাল সন্ধ্যা সূর্যের উদয়াস্তের লীলা। যেন আমাদের মুগ্ধ করার জন্যই আকাশের নিবিড় নীলিমা কখনো সাদা মেঘের ভেলা ভাসায় কিংবা কখনো ঢাকে কালো মেঘে। যেন আমাদের আলোর বার্তা শোনাবে বলেই লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে ভেসে আসে নক্ষত্রমণ্ডলীর ক্ষীণ দীপ্তি। যে কবির মন ভূমার আকর্ষণে ভুলেছে সে কি ঐ রূপ ঐ সুধার স্পর্শ না নিয়ে পারে। কবির মনের দ্বারে সাড়া তুলবে বলেই তো এত আয়োজন। যুগযুগ ধরে দিনযামিনীর এই মালা গাঁথা, অনন্ত কাল ধরে মানুষের জীবনের বিচিত্র তরঙ্গের ওঠা নামা এ সবই তো সেই এক অনাগত আগন্তুকের জন্যে, যার মনের কাছে বার্তা পৌঁছাবে, আলোকমন্ত্র যার সৃষ্টির কর্মশালার মধ্য দিয়ে সর্বকালের মানুষের সামগ্রী হয়ে উঠবে। সেই বহু অপেক্ষিত কবি রবীন্দ্রনাথ যিনি সবিতার তেজে, সূর্যের কিরণধারায় স্নাত হয়ে সেই অমৃত আলোর বার্তা মানুষকে শুনিয়েছেন।

প্রভাতসংগীতে কবি লিখলেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। বহুকালের ঘুম ভেঙ্গে নির্ঝর জেগেছে। জেগেছে প্রাণ, নূতন যাত্রা নূতন গতির লীলাচঞ্চলতা প্রকাশ পেলো। এমন করে প্রাণের চঞ্চল প্রবাহের সুর কখনো বোঝা যেত না যদি না ঐ সূর্যকর কবির চেতনাকে আগে থেকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে যখন থাকতেন তখন একদিন দেখলেন বাইরের পথে সূর্যের আলো পড়েছে। "সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে একটা পর্দা সরিয়া গেল।···আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিচ্ছেদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" অকস্মাৎ সংসারের এই সত্যরূপটা কবি দেখালেন, তার জন্য কোন প্রস্তুতি ছিলনা কোন লগ্ন গণনার অপেক্ষা ছিল না, এতদিন চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, "আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।"

সমস্ত চেতনায় একটা নাড়া লাগলো। সে আলো শুধু বাইরের পথে পড়লো না, পড়লো চেতনার সর্বাঙ্গ ছেয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোর জগতে সে এক অপূর্ব উত্তরণ, তাইতো বলতে পারলেন "আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর"। ঐ যে রবিকর নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙ্গতে এলো ওতো কবির চেতনায় মুখশের মুহূর্তের অপূর্ব জাগরণ।

সূর্যমন্ত্রের সাধক বলেই কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর স্রষ্টারা নির্মমভাবে গতানুগতিকের বেড়া ভাঙতে পেরেছেন, আর তেমনি আশ্চর্য রসবোধের সঙ্গে নূতনকে গ্রহণ করেছেন নূতন সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে। জীবনকে নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাঁরাই দেখতে পেরেছেন আলোর জন্য অন্তরে অফুরন্ত তৃষ্ণা ছিল বলেই। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই আলোর উপাসনা করেছেন সারাজীবন আর বিশ্বের রসিকচিত্তকে বিতরণ করেছেন সারাজীবন ধ্যানলব্ধ আলোর কণিকা। এই যে পৃথিবী তার তরুশ্রেণী সাগরপর্বত নিয়ে নানা খেলায় কাল কাটিয়ে চলেছে তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ আছে—এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ প্রিয় ভাব। একটি



মানুষ বা একটি প্রাণ সে কি কেবল একটা দুর্ঘটনা; তার কি বৃহত্তর কোন জীবন প্রবাহের সঙ্গে যোগ নেই, তার আসা তার যাওয়া সবটাই কি কোন খেয়ালীর খেয়াল মাত্র। নানা কবিতায়, নানা প্রবন্ধে, নানা চিঠিপত্রে কবি বার বার বলেছেন যে কোন অনাদিকাল থেকে জীবনের স্রোত চলছে, সেই স্রোত জড়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে অবিরল ধারায় বয়ে চলে; চেতনে-অচেতনে তার প্রকাশ। সেই যে গোপন প্রাণপ্রবাহিণী পৃথিবী কবি তাকে বলেছেন সূর্যসনাথা। বহুকালের আদিম প্রাণপ্রবাহ আজও বহে চলেছে অণুদের প্রাণের মধ্য দিয়ে। তাই বলেছেন, "…যখন সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার মনের এই ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব"। স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সেই স্মৃতির অতীত কাল থেকে যে প্রাণের প্রবাহ তা সূর্যতেজে সঞ্জীবিত বলেই কালে কালে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। তাই তো পৃথিবী সূর্যসনাথ; তাই তো রবীন্দ্রনাথের সূর্যবন্দনা প্রকৃতপক্ষে জীবনবন্দনা।

পুরবীর "সাবিত্রী" তাঁর সূর্য প্রণামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ। ঐ কবিতায়ও কবি বলেছেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাতে বাহুবীণাবক্ষ, দীপ্তকেশ উদ্‌বোধিনী বাণীর চুম্বন তাঁর কপালে লেগেছিল। সে প্রথম প্রভাত মানুষের স্মৃতির ওপারে, দিন গণনার বেড়া বেঁধে মানুষ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সেই চুম্বন যে অতৃপ্তির দাহ বুকের মধ্যে জাগিয়ে দিল, সেই অতৃপ্তি কবির ভাষাকে উদ্দাম আবেগে তরঙ্গিত করেছে। সকল তমসা ধ্বংস করে আদিকবি সূর্যের বাঁশী বেজে উঠুক, সে বাঁশী আর কেউ নয় সে কবিরই চিত্ত। আদিকবি সূর্যের বংশীধ্বনি কবির চিত্তের সকল তমসা দূর করুক। কিন্তু শুধু তো প্রার্থনা নয়। যুগ যুগ ধরে যে সূর্য বিশ্বলোকে প্রাণ বিকীর্ণ করে চলেছে, বিতরণ করেছে তেজ তার সঙ্গে নিজের ধাতুগত ঐক্য ঘোষণা। কত যে অজস্র প্রাণকণিকা সেই প্রাণকেন্দ্র তেজোময় অগ্নিপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার শেষ নেই। পৃথিবীর চেতন অচেতনে প্রাণের অজস্র সমারোহ ভেসে আসছে প্রতিদিন তাই কবি বলেছেন,

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান সুরের তরণী
আয়ুস্রোত মুখে,
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।

যুগ যুগান্ত ধরে আদি কবি তাঁর ছিন্নতান সুরের তরণী পাঠিয়ে চলেছেন। মূল সুরের আবেগ আদি কবির প্রাণের কম্পন তাঁর মনের অন্তরমহলে সৃষ্টির কাজ সুরু করে দেয়। নানা বর্ণে নানা স্বপ্নের জাল বোনা হতে থাকে। কিসের প্রেরণা আসে, কি সে শক্তি যা তাকে এমন করে ভরিয়ে তোলে কবি অবাক বিস্ময়ে ভাবেন—"তেজের ভাণ্ডার হতে কি অজস্র দিয়েছ যে ভরে কেই বা তা জানে।"

এমনি করে যে প্রাণ ভরে রেখেছে, দিয়েছে জীবনের শক্তি সেই রবি যখন শরতের সোনায়

বাঁশীতে মূর্চ্ছনা জাগায় বিশ্ব তখন উন্মনা হয়ে ওঠে। কোন সুদূর মনকে হরণ করে নিয়ে যায়, কিসের ডাকে কবির রাগিণী বিবাগিনী হয়ে চলে,

সে কি তব সভাস্থলে যজ্ঞাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি।

দিন যখন শেষ হ'বে তখন অগ্নিউৎস ধরে তাঁর রাগিণীর সকল আবেশ ধৌত হবে। "সাবিত্রী" রচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব, কারণ গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর ধারণার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।

সূর্য উঠবে, সে সূর্যের আলো যদি প্রাণের মধ্যেও না অন্ধকার ঘোচায় তবে কি হবে তার ওঠায়। বহুকাল ধরে মানুষ প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়ায়, সংসারের নানা তুচ্ছ বস্তু তাকে ঘিরে ফেলে। তার অন্তরতম সত্যস্বরূপ বস্তুর আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। হাসিকান্নার আবর্তে পাক খায় মানুষ, স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্বুদে ফেনিয়ে ওঠে জীবন। প্রতিদিন রাত্রি আসে, আকাশ অন্ধকারে ভরে যায়, কিন্তু আবার আসে প্রভাত "প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশ" নিয়ে। সেই জেগেওঠা দেখে সেই আলোর বন্যা দেখে কবি আপন অন্তরলোক অন্বেষণ করেন। যদি পৃথিবীর প্রত্যহকার অন্ধকার ঘোচে তবে মনের অন্ধকার কেন ঘুচবেনা। উপনিষদের ঋষি বলছেন, "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" কবি সেই মন্ত্রই বাংলায় বলেছেন,

তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা মন্ত্র—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন—হে পূষণ
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।

এই যে অণুপরমাণু নিয়ে গড়া দেহ এই দেহ সেই সবিতার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায় রচিত। এর স্থূল চেহারাটা প্রতিদিনই তো দেখছি, নানা কাজে ঐ দেহটা নিয়েই মেতে থাকতে হয়। কিন্তু কোন্ অজানা দিন থেকে ঐ রবিরশ্মি বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্ত করে দিই নিজেকে, "প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ" আর বলি,

হে সবিতা
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ এই আচ্ছাদন।

আর তোমার অগ্নিকণায় রচিত এই দেহের মধ্যে অণুপরমাণুর অলক্ষ্য অন্তরে যে কল্যাণতম রূপ আছে "তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে"। চিরকালের যোগ কবির অন্তরতম সত্যের সঙ্গে ওই সবিতার, যার বন্দনামন্ত্রে বালক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অশ্রুসজল করে তুলতো। শুধু নিজের সঙ্গেই যে যোগ তাও নয়, যুগসন্ধির কবি ইতিহাসের মধ্যে মানুষের মনের কথা শুনেছেন, যে কথা ঐ স্তিমিতকেন্দ্র জ্যোতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ঘোষণা করে সকল তুচ্ছতার বাইরে নিয়ে যায় তাকে,



তোমার জ্যোতির স্তিমিতকেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহাস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল মহানদীর তীরে
কখনো পারস্য সাগরের কূলে
কখনো হিমাদ্রি শিরিতটে—
বলেছে, জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহানপুরুষের আবির্ভাব।

এমনি করে শুধু প্রাচীন যুগে নয়, শুধু নিজের দেহে নয়, সর্বকালের সর্বযুগের মানুষ যে তার সমস্ত সত্তায় অন্ধকারের পার থেকে আদিত্যবর্ণ মহানপুরুষের আবির্ভাব দেখেছে, কবি সেই দেখার কথাই বলেছেন। জীবনকে আলোর মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্যই কি গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর জীবনকে তাঁর পিতার জীবনকে তাঁদের পারিবারিক জীবনকে এমন করে ফুটিয়ে তুলেছিল!

পত্রপুটের ১৫নং কবিতায় কবি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সূর্যের যোগ দেখিয়েছেন। সামাজিক অনুশাসনের বাঁধা পথ দিয়ে যে ধর্মের রথ চলে সে রথে কবির আসন নেই। নানা শাস্ত্রে যাকে সপ্রমাণ করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব ঘোষণায় অহংকৃত পাণ্ডিত্য নিয়োজিত তাকে কবি স্বীকার করেন নি, তাই দেবতার বন্দীশালায় তাঁর নৈবেদ্য তিনি পাঠান নি। যে প্রাণের মন্ত্র তাঁকে বহির্জীবনের অবকাশে দৃষ্টি মেলে সুন্দরের সাধনা করতে শেখালো সে মন্ত্র কি বন্দীশালার দেবতাকে পূজা করে খুশী হতে দেয়। যে বিশ্বশরণ তাঁর জগৎ মন্দিরে সমাসীন তাঁকে পেতে হ'লে জাতের বেড়া তুলে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার পূজার অর্ঘ সাজালে তো চলবে না। কবির সত্তা তো অত ক্ষীণ প্রাণ নয়, সে মহৎ উৎস থেকে শক্তি পেয়েছে। সেই "সাবিত্রী"র প্রতিধ্বনি এখানেও শোনা গেল,

প্রথম প্রাণের বলিষ্টউৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী
ঘিরেছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

যে তেজোময়ী লহরী অনির্বচনীয়ের স্পন্দন এনে দেয় সে কি কবিকে কোন সংকীর্ণতার আবরণে বাঁধা থাকতে দেয়। কবির মনে সেই পরম অনুভূতি আসে যে একদা কোন অতীতকালে সৃষ্টির প্রথম দিনে তাঁর সত্তা বিলীন ঐ সৃষ্টির আদিকেন্দ্রে,

প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিকণ।

সেই অব্যক্ত সত্তা জেগেছে দিনে দিনে। সৃষ্টির আলোকতীর্থে তাঁর ভবিষ্যৎ জ্যোতি হয়ে সুপ্ত ছিল তাই প্রতিদিনের জেগে ওঠাই তাঁর পূজা। তাই তো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের পূজা নীতিবন্ধনে বাঁধা পড়লো না। অনাদিকাল আগে যার সত্তা ছিল সূর্যের বাষ্পদেহে বিলীন কি করে

সে সত্য বলে মেনে নেবে দ্বাররুদ্ধ দেবপূজার মন্দিরকে। তাইতো আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সৃষ্টির প্রথম রহস্য, সে আসে আলোকের অমৃত নিয়ে।

তাই রবীন্দ্রনাথ সূর্যসনাথ। যে গায়ত্রীময় অঙ্কারণে জল এনে দেয় চোখে অল্পবয়সে, সেই মন্ত্র কি আশ্চর্যভাবে সার্থক হলো জীবনে। জীবনের কবি জীবনের তেজোময় কেন্দ্রকে কি অপূর্ব বন্দনা করেছেন। প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্থ গাছ তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন,

প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশ্বত্থগাছ
সূর্য-মন্ত্র-জপ করা ঋষির মতো।

সে মন্ত্র যেমন প্রাণে চঞ্চলতা দেয়, তেজ দেয়, আবেগে ভরে, তেমনি ঐ একলা অশ্বত্থের মতো শান্তি দেয় স্থৈর্য দেয়।

জীবনে যে আদর্শ যে মহত্তের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন তাকে তাঁর ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্তগুলিতেও সুরে ধরে রেখেছেন। প্রভাতসূর্য রুদ্রসাজে তাঁর কাছে আহ্বান পাঠায়, সেই আহ্বান কবিকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। প্রভাত আলোর সুরে কবি নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন, সুরের মূর্ছনায় আবেদন ধ্বনিত হয়, "বাজাও আমার বাজাও"। আলোকের ঝরণাধারায় কবি নিজেকে সব দীনতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত করেন। নিজের ঘুমন্ত সত্তাকে জাগানোর জন্য কবির প্রার্থনা—"অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও"। আলোর স্পর্শ পেয়ে যখন মুগ্ধ হয়ে দৃষ্টি ফুটে ওঠে তখনই কবি বলেন "ধন্য হলো অন্তর"।

বৃক্ষবন্দনা করেছেন যেখানে সেখানেও না বলে পারেন নি যে, যে তেজ দান করে বনস্পতি মানুষকে ধন্য করেছেন সে তেজ সবিতার দান। যে আলোক সারাদিন আকাশ পরিক্রমণ করে তার দীপ্তিতে সুন্দর হয়ে বনস্পতি সুন্দরের সাধনা করেছে—কবি তাঁর গভীর সৌন্দর্যের অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে সেই প্রথম সুন্দরের রেখাচিত্র যখন ধূসর পৃথিবীর পটভূমিকায় আঁকা হলো তখন প্রাণের বন্যা এসেছিল ঐ আলোকধারা থেকেই। সূর্য শুধু প্রাণের কেন্দ্র নয় রূপের কেন্দ্রও বটে—

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার পত্রপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপনপ্রাণে রূপশক্তি সূর্যালোক হতে।

কিন্তু বিশ্বের সব কিছুকেই শুধু রূপ নয় প্রাণও দিয়েছে সূর্যালোক, তাই ওই বনস্পতি যে মঙ্গলের অর্ঘ দিয়েছে মানুষকে বার বার তাকে কবি বলেছেন,

ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিন স্নেহ দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী।"

"যাত্রী"তে কবি সূর্যপ্রণামের সকলমন্ত্র একসঙ্গে বলেছেন। "সূর্যের আলোর ধারা আমার নাড়ীতে



নাড়ীতে বইছে···সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে"—এই কথাই পত্রপুটে বলেছেন,

সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

"যাত্রী"তে কবি বলছেন, "আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী"। পত্রপুটে বলেছেন,

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।

"যাত্রী"তে বলছেন যে, সূর্যের জ্যোতি "বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে"—ঐ কথাই বলেছেন বৃক্ষবন্দনায়, তাই অশ্বত্থগাছ তাঁর চোখে "সূর্যমন্ত্র জপ করে ঋষির" মূর্তি নিয়ে এসে দেখা দেয়।

ভারতবর্ষ প্রার্থনা করেছে "তমসো মা জ্যোতির্গময়ো", অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও আলোয়, সূর্য তাঁদের মন্ত্রে "ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ"। প্রাচীন ভারতের মন্ত্র কবি পেয়েছিলেন মহর্ষির শিক্ষার আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে। তাই তো সূর্যসনাথ কবি বার বার আকুল হয়ে বলেন—"আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।"

# রবীন্দ্রচেতনা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখি সেখানে কত সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছে। কিন্তু তার ফলে ভারতীয় জীবনধারাতে কখনো কোনো বড়ো পরিবর্তন আসে নি। বরং সেই জীবনধারা প্রাচীনতার সঙ্গে-সঙ্গে কেবল জীর্ণতা অর্জন করেছে। শেষে এলো ইংরেজ। তার মানদণ্ড যেন যাদুদণ্ড। সেটার ছোঁয়া লেগে ভারতীয় জীবনধারার উপর তলা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। ভারতের আকাশে প্রথম প্রভাতের উদয় হয়, অথচ সে যে অহল্যার মতো দীর্ঘকাল অন্ধকারে কাটায়। ইংরেজের আগমনে কোন আলো তার চোখে লাগল!

ইতিপূর্বে বাইরের থেকে অন্যান্য যে সব শক্তি এসেছে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্পর্শ করার প্রবৃত্তি তাদের হয় নি। ইংরেজ সেই ভিত্তিটাকে ধরে দিল একটা প্রচণ্ড নাড়া। তারা তো ব্যবসা করতেই এসেছিল; ব্যবসার সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্পর্ক নিগূঢ়। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজদের প্রভাব এমন ওতপ্রোত। প্রভাব যতই ওতপ্রোত হোক-না কেন ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক ছিল পরাধীনতার। পরাধীনতার সম্পর্ক তখনই আসে যখন এক দেশের ধন অন্য দেশ ভোগ করে। শোষণের খোঁড়া দৈত্যের ঘোড়া হয় কানা দৈত্য। অর্থাৎ শাসন। শাসনের শতেকরকম ছলাকলা ইংরেজ এদেশে চালু করেছিল। সংস্কৃতির প্রসার তার একটি। ভারত বিজেতাদের মধ্যে কেবল ইংরেজদেরই সংস্কৃতি ছিল তুলনাতে উন্নত ও অভিনব। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে মিশনারী পাদ্রীতে দেশ ছেয়ে গেল। সর্বত্র ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'লো। আর ইংরেজ মহলও বিজিতদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওদাসিকবাণ হতে লাগল।

ভারতবর্ষের মতো সভ্য দেশের পক্ষে এই সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করা অনিবার্য ছিল তাই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এক স্ববিরোধী মনোভঙ্গি দেখা যায়। পরাধীনতার দরুণ কখনো ইংরেজের প্রতি দারুণ ক্ষোভ আবার সমৃদ্ধ সংস্কৃতিজনিত কখনো সেটা শ্রদ্ধা। আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা প্রথম রূপ পায়। তিনি ভারতের পুরাতন শাস্ত্রগুলিকে নতুন মূল্যবোধে বিচার করলেন। নতুন মূল্যবোধে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যতটা মিল তার চেয়ে বেশি মিল দেখা গেল ইংরেজদের সঙ্গে। কিন্তু এই মূল্যবোধটা ইংরেজ নামক কোনো একটা বিশেষ জাতির নয়, আসলে তা রেনেসাঁ রিফর্মেশন ফরাসী বিপ্লব শিল্প-বিপ্লব প্রভৃতি চূড়াস্পর্শী বুর্জোয়া শ্রেণীর। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম সূত্রগুলি রাজার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ভারতের সমস্যা যে মূলত সামাজিক এটাও তিনি সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। কিন্তু তার আশু সমাধান জাতীয় স্বাধীনতার পথে সম্ভব। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের বীজ ছিল ইংরেজি শিক্ষিত এক সঙ্কীর্ণ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। কিন্তু বীজ থেকে যে মহীরুহ হলো



তার মূল চলে যায় সমাজের নিম্ন স্তর অবধি। এবং সেই মহীরুহের শাখাতে যে মুকুল ধরে সেটা প্রাতিস্বিকতার বা ব্যক্তিচেতনার।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম এমন এক পরিবারে যেখানে প্রাচীন ও নবীন দুটো ধারাই বর্তমান ছিল, সে দুটোর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হয় নি তখনো। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের শক্তি আহরণ করেছিলেন প্রাচীন ধারার থেকে, যদিও তাতে প্রাচীনতা ছিল না। আবার আধুনিকতার মর্মকথা ওই ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম মর্মরিত হয়। ঠনঠনের পোড়ো বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে গুপ্তসভা স্থাপন করেন দেশোদ্ধারের জন্য সেইটেই প্রথম গুপ্তসভা। ঠাকুরবাড়ির উদ্‌যোগে সৃষ্ট হিন্দু মেলাতেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা হয়।

সেটা ছিল পরিবর্তনের যুগ। জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহ তখন ব্যাপক আকার নিচ্ছে। ওদিকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল উন্মোচনে ভারতবর্ষের সম্মুখে অন্য এক জগতের দ্বার অবারিত হলো; বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হ'লো। তখন জর্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ হবার সাফল্য এবং আমেরিকাতে নিগ্রো দাসদের স্বাধীনতা লাভ ভারতবাসীর চিত্তে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগাল, তাকে অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনে যোগাল দুর্বার প্রেরণা। সাহিত্যে নতুন যুগ প্রবর্তন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সমাজ-জীবনে উদ্‌গত জাতীয় চেতনা সাহিত্যেও কৈবল্য খুঁজে পেল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলকাতাতে নেশনাল থিয়েটার স্থাপিত হলো, অমৃতলাল বসু গিরীশচন্দ্র ঘোষ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতি ছিলেন যার উদ্যোক্তা। আর তার পূর্বে থেকেই নীলদর্পণ, বীরনারী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী প্রভৃতি নাটকে আমাদের নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হতে সুরু ক'রেছিল।

এমনিভাবে দেশের ইতিহাসের ধারা যখন একটা বাঁক নিচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। মহাকবিদের আবির্ভাবই হয় দেশের যুগপরিবর্তনের সময়। যখন মধ্যযুগ অপসৃয়মান ইটালিতে তখন ডান্টের, যখন রেনেসাঁ আলো পেয়ে ইংলণ্ডের গৌরবময় ইতিহাসের সূত্রপাত হচ্ছে তখন শেকস্‌পীয়রের এবং জর্মানিতে জাতীয় আন্দোলনের মৌসুমি নেমেছে যখন, গ্যয়টে, স্ব-স্ব প্রতিভার উপযুক্ত ভূমি পেয়েছেন। এঁদের সাহিত্য যেমন স্বকালের তেমনি উত্তরকালের। তা যেন একটি বিচিত্র দর্পণ যাতে সাহিত্যিকের স্বকাল আত্মরূপ দর্শন ক'রে বলে, এই আমি, আমার ছবি। উত্তরকালও সেই দর্পণে আপনার পথের নির্দেশ পায় ও বলে, এমনি আমি ছিলাম, এই আমার উৎস: এর ধারাতে আমার পুষ্টি এবং এর অভাবে আমার লুপ্তি। তেমনি রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রশিল্প। তাঁর সৃষ্টি তাই সমসাময়িককালের ইতিহাসও বটে।

কিন্তু রবীন্দ্রচেতনা কখনো শিল্পের একটি মাধ্যমকে অবলম্বন ক'রে বিকশিত হয় নি। কখনো তার বিকাশ ঘটেছে কাব্যে, কখনো উপন্যাসে, কখনো চিত্রশিল্পে। স্বকালের অভিক্ষেপ যখন কাব্যে মেলে না তখন তা ছোটগল্পে বা উপন্যাসে মেলে। অথবা চিত্রশিল্পে। অথবা নাটকে। তবে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে তার চেতনা বিকশিত হয়ে থাকলেও মূলতঃ প্রতিটি মাধ্যমই কম-বেশি তাঁর কবি-কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেবল সেই হিসেবেই তিনি মূলতঃ কবি, প্রচুর কবিতা লিখেছেন বলে নন।

এই কারণে রবীন্দ্রপ্রকৃতির সমগ্রতা বিচার বিভিন্নমুখী আলোচনা সাপেক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর চরম চূড়া থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথ বিস্তৃত। এই দীর্ঘ যাত্রায় অনেক যুগের অনেক ভাবধারার উত্থানপতন ঘটেছে। সেই প্রথম স্বাদেশিকতা এক শতাব্দী পরে আমাদের কাছে গল্প কথা, আর সভ্যতার সংকট ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কাছেও দুঃস্বপ্নের অতীত। অথচ রবীন্দ্রনাথ এ সব কিছুরই সাক্ষী। এবং সরব সাক্ষী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারবাসী থেকে সমগ্র বিশ্বপরিবারবাসী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আত্মচেতনা মাঝে মাঝে তীব্র মোড় নিয়েছে ও নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ড এমন বিশাল ছিল যে তার বিপুলতা আমাদের বিমূঢ় করে। শ্রীনিকেতন স্থাপন করা থেকে রাজনীতি পর্যন্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথ বাদ দেন নি। জীবনের বিভিন্ন দিকে ও আপাত দৃষ্টিতে বিপরীত দিকগুলিতেও তাঁর অপরিমিত সৃষ্টিক্ষমতা অদম্য ও দুর্মর ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তিনশ' বছর পরে যদি কোনো সমালোচক এই বলে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যে চিত্রায় রবীন্দ্রনাথ হলেন উধো আর চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বুধো তবে অবাক হবার কিছু নেই। ভরসা এই যে তিনশ' বছর পরেও যোদ্ধার অভাব হবে না। তাঁরা এই যোদ্ধাকে খারিজ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সূর্যের তুলনা সব দিক দিয়েই যথাযথ। যেমন সূর্য দিগন্ত-রেখা ছাড়িয়ে আকাশে যত উঠতে থাকে তার রশ্মিসংখ্যা তত বাড়ে ও তা অচিরে একটা অসহ্য উজ্জ্বলতাতে পরিণত হয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঋদ্ধিপূর্ণ ও তৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। যেন নীহারিকা আস্তে আস্তে গ্রহ হচ্ছে বা ফটোগ্রাফার ডার্করুমে নানা পদ্ধতির দ্বারা অদৃশ্য ছবিকে প্রত্যক্ষ করে তুলছে। যা ছিল সম্ভাবনা তা ধীরে ধীরে সম্ভব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবন একান্তরূপে পরিণতমুখী। নির্ঝর যেমন নদীমুখী, নদী যেন পারাবারমুখী। যেদিন রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিন নিজেও জানতেন না যে ওই কবিতাতে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হলো। সমস্ত কাব্য মানে তাঁর সৃষ্ট সমগ্র শিল্প। যখন সূর্য উঠে এল গাছের আড়াল থেকে, অকিঞ্চিৎকরতা ও প্রাত্যহিকতার দেওয়াল সেই আলোতে সহসা বালক কবির কাছে ধরা পড়ল। কবির চারপাশে দেওয়াল, তিনি যেন এক কারাগারে আবদ্ধ এবং তা ভেঙ্গে প্রাণের মৌল ব্যাপ্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের আর্তি সেই প্রথম কাব্যে মূর্ত্তি পেল তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐ কারাগার ভাঙার অথবা সেখান থেকে পলায়নের আকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘকাল কাব্যে রূপ দিয়ে চললেন। পরিবেশের সঙ্গে পরিবেদনের, কর্মজগতের সঙ্গে কর্মসত্যের বিরোধকে, যা কিনা রোমান্টিক আন্দোলনের সমস্যা, রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার আলোতে দেখেছিলেন। তিনি যে-আবহাওয়ায় যে-শিক্ষায় মানুষ হয়েছিলেন তাতে সব কিছুকে আধ্যাত্মিকতার আলোতে দেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আলো যা-ই থাকুক, ওই কবিতার মূল প্রবেগ নিঃসৃত হয়েছিল আপনার চারপাশে এক কারাগার অনুভব ক'রে। তখনকার দেশের অবস্থা তখনকার সমাজব্যবস্থা এক বদ্ধ ডোবা। জাতীয় চেতনা সবে জাগ্রত হ'য়েছে এবং দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার জন্য পথ খুঁজছে। যে-কথা কবির মনে হ'য়েছে একই কথা তখন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ পুরুষদেরও মনে হচ্ছিল।



একদিকে বিদেশী শাসকের শৃঙ্খল অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় আন্দোলনের ফাঁদ। আবার ওই দুটো শক্তির বিরুদ্ধেই ঠাকুর পরিবারে সংগ্রাম চলছিল।

রক্ষণশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনিবার্য ছিল। তাঁর পরবর্তী কাব্য যে ঐহিকতায় মুখর হয়েছে তার মূলে কেবল যৌবনের উন্মাদনাই ছিল না। আবার এই সমাজকে অস্বীকার করবার চেষ্টাও 'মানসী'-তে দেখা যায়। এই কাব্য নারী সম্পর্কিত চেতনার অভিনবত্বে উত্তপ্ত, প্রকৃতি-বর্ণনার প্রসঙ্গে উদ্দীপিত ও সর্বোপরি আত্মকেন্দ্রিকতাতে আত্মহারা। আবার এই কাব্যে তিনি স্বার্থপর নেতাদের বিদ্রূপও করেছেন। কিন্তু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, আত্মবিস্তারের কল্পনাতে প্রাতিস্বিকতার যে-বীজ ছিল 'মানসী'র আত্মকেন্দ্রিকতায় তা হারিয়ে যায় নি। এর পরবর্তী জীবনদেবতার যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যে পাশাপাশি দুটো মনোভঙ্গি দেখা যায়। জীবনদেবতা কখনো একান্তরূপে প্রকৃতিপ্লুত কখনো বাস্তবকে স্বীকার ক'রে সেটাকে নতুন ভাবে গড়তে চেয়েছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে এমন এক আশ্রয়স্থল যেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-বিকাশ ব্যাহত হয় না, যেখানে বর্ত্তমান জীবনের সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা নেই। এই বাস্তব জীবন যে তাঁর কাছে অসহনীয় সে কথা এই সময়কার ছোটগল্পগুলিতেও ফুটে উঠেছে। বস্তুত এই সময় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ছোটগল্পের জোয়ার এসেছিল। এবং এই ছোটগল্পগুলিতে একটি সত্যকে তিনি বার বার ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ছোটগল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে মানবজীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিজগতের ঘটনাকেও তিনি বর্ণনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এই বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতিজগতের বৈপরীত্যটাই সেখানে প্রকটিত। মানবচিত্তে যখন প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকৃতি জগতেও তখন তাণ্ডবলীলা চলে এই হলো কথাশিল্পীদের চলতি দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে দেখি মানবজীবনে যখন কোনো ভয়ংকর ট্র্যাজেডী সংঘটিত হচ্ছে প্রকৃতি জগতে তখন আশ্চর্য শান্তি বিরাজ করছে। এই বৈপরীত্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এই যে, মানবজীবনে বৃহত্তর যুদ্ধতা সংকীর্ণতা আছে বা মানুষের ব্যক্তি-বিকাশের প্রতিকূল, যা মানুষের ব্যক্তিমূল্যকে স্বীকার করে না। মানুষের ব্যক্তিমূল্য যে অবশ্য স্বীকার্য অথচ পারিপার্শ্বিক তার অনুকূলে নয় এই চেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রকৃতির দিকে ঝুঁকেছেন। কেননা তা এমন জায়গা যেখানে গিয়ে কবি বলেন, 'দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো'। আবার যে-প্রবেগে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে বিস্তারিত ক'রে দিতে চান সেই একই প্রবেগ থেকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি উৎসৃত হয়েছে। সেখানে জীবনের সংকীর্ণতা ভেঙে এমন এক 'মহাবিশ্বজীবনের' কল্পনা কবি করেছেন যেখানে মানুষের আত্মবিকাশ হবে সুসম্পূর্ণ। সংকীর্ণ জীবনকে ত্যাগ ক'রে প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিকাশের পথ অন্বেষণকে যদি ধরা যায় নেগেটিভ রোমান্টিসিজম তবে সেই সংকীর্ণ জীবনকে ভেঙে তাকে ব্যাপকতা দেওয়ার অঙ্গীকারকে পজিটিভ রোমান্টিসিজম বলা চলে।

কিন্তু বাস্তব জীবন বিকৃত ব'লে তার থেকে সরে গিয়ে প্রকৃতি আর কল্পনা, এই নিয়ে বেশিদিন থাকা চলে না। তাতে যে-অসম্পূর্ণতা আছে তা রবীন্দ্রনাথকে ভিতরে ভিতরে বাধিত ক'রে

তুলেছিল। এই যেমন গেল কবির ব্যক্তিগত সমস্যা তেমনি সামাজিক দিকও আছে। জাতীয়চেতনা ক্রমশ তীব্র হ'য়ে উঠেছে, অথচ জাতীয় মুক্তির পথ তখনও শুক্তিস্থিত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে বটে। কিন্তু তার প্রতি কবির আস্থা নেই। দেশের অন্তরাত্মার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো যোগ ছিল না। সেটা পাশ্চাত্যচিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন ও তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা দৈন্যের ভাব প্রকট ছিল। তাই সেই 'দুঃসময়' কবি প্রাচীন ভারতের স্বরূপ সন্ধানে সাহিত্যের পাথার পাড়ি জমালেন। ভারতের মর্মমণি রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের কোনো পুঁথি পড়ে পাননি, পেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য থেকে। 'কল্পনা', 'কথা', কাহিনী' প্রভৃতি কাব্য তাঁর প্রাচীন ভারতভ্রমণের কাহিনী।

এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে একান্ত নিমগ্ন ছিলেন আর তাঁর চারিদিকে ছিল জীবনদেবতার আবরণ। কিন্তু প্রাচীন ভারত ভ্রমণের পর সে-আবরণ খসে পড়ল। এবার নিঃসংশয়রূপে রবীন্দ্রনাথই আত্মপ্রকাশ করলেন বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে। সমাজ ও সামাজিকতার প্রতি অবজ্ঞাতে, প্রচলিত আচার ও নীতির অস্বীকারে 'ক্ষণিকা'-র কবিতাগুলি দীপ্ত ও তীব্র। একমাত্র আপনাকে বাদ দিয়ে কবি এখানে আর সবকিছুর প্রতিই উদাসীন। কবির সুখ-দুঃখ, কবির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কবির মনের বিভিন্ন ভাবতরঙ্গ, এক কথাতে কবির ব্যক্তিসত্তাটিই এই কাব্যের বিষয়। কেবল আধেয়তেই রবীন্দ্রনাথ একান্ত নিষ্ঠায় আপন ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করলেন তা নয় আধারেও পূর্বার্জিত সকল সংস্কার বর্জন ক'রে এক ব্রাত্যাদর্শ গ্রহণ করলেন। কিন্তু 'ক্ষণিকা'-র ব্যক্তিরূপটি খণ্ডিত, তাতে অস্বীকৃতি ও নেতিবাচক দিকটাই কেবল ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাকাব্যে 'ক্ষণিকা' নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন এলেন ভারতবর্ষে। তাঁর নীতির স্বরূপ প্রথম থেকেই তিনি স্পষ্ট করে তুললেন। দেশের ভাবী দুর্যোগের ছায়াতে রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' লিখলেন। কেবল দেশের দুর্যোগ নয়, বিশ্ব-ঘটনাও রবীন্দ্রকাব্যে এবার প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলল। 'শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল' কবিতাটি উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে বুয়র-যুদ্ধ ঘোষণার প্রসঙ্গে রচিত। 'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি সমসাময়িক। অথচ দুইটি কাব্যে আপাতদৃষ্টিতে কতই তফাৎ। সম্পূর্ণভাবে একটি ব্যক্তিচেতনা থেকে অন্যটি জাতীয় চেতনা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু বাস্তব-প্রস্তাবে এই দুই চেতনার সম্পর্কে নিগূঢ় এবং নিবিড়। ব্যক্তিচেতনা অসম্ভব জাতীয় চেতনা ব্যতীত, জাতীয় চেতনাই ব্যক্তিচেতনার জননী। রবীন্দ্রনাথ তো জন্মেই ছিলেন জাতীয় চেতনার উষ্ণ আবহাওয়ায়। সেজন্যই গোড়া থেকে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তি-চেতনার প্রাধান্য।

এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর জীবনেও নানা পরিবর্তন এল। পদ্মা ও পদ্মার উর্বর তীরভূমি ছেড়ে কোপাই ও কোপাইয়ের উষর তীরভূমিতে এলেন। পত্নী-কন্যা-পিতা-পরিজনের মৃত্যুর শোক কমল তাঁর জীবনে। তবু তার মধ্যে আন্দোলনের কাজে বিরাম নেই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার হলে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। তাতে তিনি গ্রামোন্নয়নের সুনির্দিষ্ট



পরিকল্পনা দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মহাত্মাজীর আগমনের বহু পূর্বেই, যে ভারতের মর্মকেন্দ্র তার গ্রামে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিচ্ছেদের দিন নির্দিষ্ট হ'লো। যে-আগুন এতদিন ধিকিধিকি জ্বলছিল তা এবার ফেটে পড়ল ভীম বিস্ফোরণে। দেশবাসীর মনে সে কী উন্মাদনা! স্বাদেশিকতার সে কী প্রবল প্লাবন। সেদিন সমস্ত দেশ রবীন্দ্রনাথকে নেতা বলে স্বীকার ক'রে নিল। কিন্তু অচিরে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নেতাদের মতভেদ দেখা দিল। অন্যান্য নেতারা একে তো ভারতের সমস্যাকে সামাজিক বলে মনে করতেন না, তদুপরি স্বদেশের স্বার্থের চেয়ে সম্প্রদায়ের স্বার্থকে তাঁরা বড় বলে তুলে ধরতে লাগলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ধর্ম পর্যন্ত গড়াল। শেষে গভীর বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলন থেকে স'রে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেশ তাঁর পথ নেয় নি, হয়তো সেপথ নেওয়ার মতো অবস্থাতে দেশ তখনো পৌঁছয়নি। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে নতুন খাতা খোলা এত সহজে হবে না, তার আগে অনেক বাকি বকেয়া শোধ করতে হবে। দুঃখের তিমিরে মঙ্গলের আলো জ্বলবে। 'খেয়া'র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে বরণ করার কথা লিখেছেন, কেননা সত্যের বিনিময়ে দুঃখকে মূল্য হিসেবে ধরে দিতে হয়।

কিন্তু এই সময় রবীন্দ্রপ্রতিভা আত্মবিকাশের যথার্থ মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে কাব্যে নয়, উপন্যাসে, 'গোরা'তে। জাতীয় চেতনার জন্ম ও তার ব্যক্তিচেতনার উদ্ভব দুটোই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় গৃহীত হ'য়েছে। অভিজ্ঞতার এই সম্পূর্ণতা ও যথার্থতা রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেনি। ফলে 'গোরা' উপন্যাস কেবল তাঁর হাতেই সম্ভব। তাছাড়া প্রাগুক্ত অভিজ্ঞতা বহন করার জন্য কাব্য নয়, মহাকাব্যই উপযুক্ত শকট। এ-যুগের মহাকাব্য হলো উপন্যাস। স্বদেশের জীবনে যে-বিপুল প্রাণশক্তি ও ঐকতান গুঞ্জরিত তার অন্বেষণে রবীন্দ্রপ্রতিভা ভাস্বর। কিন্তু শিক্ষিত নগর-কেন্দ্রিক শ্রেণীর পক্ষে ওই ঐকতানে যোগ দেওয়া অসম্ভব বা জনজীবনের সংহতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বদেশের আত্মাকে জড়তাদৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য রাজপুত্রের মতো গোরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাত্রা করে। কিন্তু সে খুঁজে পেল সেই আত্মাকে ব্যঙ্গ করতে পারে এমনি এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাপিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। এই দ্বন্দ্ব থেকে তিনি স্বয়ং মুক্ত ছিলেন না। গোরার ব্যর্থতা তাঁর আভিজাত্যেরই দ্বন্দ্ব। গোরা তার ওই ব্যর্থতার পরেও অভিমানহীন হয় নি, তার পথ ছাড়েনি। যদিও তার হৃদয় ইতিমধ্যে শূন্যতাবোধে অবসাদগ্রস্ত তবুও তার চৈতন্যোদয়ের জন্য আরো বড়ো আঘাত অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওই শূন্যতাবোধের পিছনে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের অসারতাই কি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল? আবার এই স্বদেশী আন্দোলনের পেছনে আইরিশ আন্দোলনের প্রেরণাও ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পিতামহ আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোরার জন্য চরম যে আঘাত অপেক্ষা করছিল তা এল যখন সে আপনাকে আইরিশ বলে জানল। গোরার মা-বাবাকে হত্যা করা কি সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিরূপতার ইঙ্গিত? এতদিন

গোরা সর্বাগ্রে কতকগুলি লেবেল এঁটে রেখেছিল কেবল, তাতে ভালোমন্দর বাছবিচার ছিল না। সে বলত যে আগে সমগ্র হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকরূপে নিতে হবে। সেখানে মন্দকেও মানতে হবে, নতুবা তার সামগ্রিকতা নষ্ট হবে। এইভাবে হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করার পর মন্দকে বর্জন সম্ভব। কিন্তু এ-কথার বাস্তব-ভিত্তি কোথায়? বস্তুত গোরার কাছে বাস্তবতা কখনো প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। আপনার সর্বাঙ্গে সে যে-সব লেবেল এঁটেছিল সেগুলো অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণ করাই তার ধর্ম হয়ে উঠেছিল এবং সেই ধর্মটাই তার কাছে জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয়তাবাদের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা অতিক্রম করার পর তা বর্জনীয়। গোরা তা বর্জনে নারাজ হয়েছিল তাই বাইরের থেকে আঘাত এসে তার খোলসটাকে ভেঙে খসিয়ে দিয়েছে। খোলস খসে যাবার পর যে-গোরা বেরিয়ে এল সে কোনো ধর্মের বা কোনো সম্প্রদায়ের ডঁকোবরদার নয়, নিতান্তই গোরা নামক এক ব্যক্তি। সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হয়েও ব্যক্তি হিসেবে তখন গোরার এক স্বতন্ত্র মূল্য জন্মেছে। উপন্যাসের শেষে যেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই কথা কয়ে উঠলেন 'আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।'

জাতীয়চেতনার মন্থন বিনে প্রাতিস্বিকতা নিরাকার থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত না হলে গোরার পরিণতি অন্য রকম হতো, অন্তত তার ব্যক্তিচেতনা সাকার হ'তো না। কিন্তু জাতীয় জীবনের যে-তাৎপর্যের সন্ধানে গোরা বের হ'য়েছিল তার কী হলো? সেখানে তার ব্যর্থতা, শূন্যতা কি রবীন্দ্রনাথকেও ক্লান্ত করে নি!

সত্যিই রবীন্দ্রনাথ যেন একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন! তাই যেন পরাপ্রকৃতির নিশ্চিত আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য,' 'গীতালি' যেন তারই আকুতি। বাস্তবিক পারিপার্শ্বিকতা যখন কবিকে উৎসাহ দিচ্ছে না, বাস্তব অবস্থা যখন প্রেরণা যোগাচ্ছে না, বরং কবির জীবন উপভোগের অন্তরায়, যখন অন্তর প্রিয়পরিজনের বিচ্ছেদে কাতর সে-সময়ই তাঁর পক্ষে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু' বলাই স্বাভাবিক, সবচেয়ে স্বাভাবিক। দেশের সমাজ-জীবন অচলায়তনে আবদ্ধ। সেই ব্যবস্থাকে সমালোচনা ক'রে লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক। কিন্তু তেমন কোনো উচ্চ কর্ম আর তখন তাঁর লেখনী থেকে ঝ'রে পড়ছে না।

জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়, প্রত্যেকটি উত্থিতি-পতৃতি, প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব যথাযথ ও অবিকলরূপে তাঁর সৃষ্টিতে রূপ পেয়েছে। বাস্তবের প্রতি এই সার্বভৌম সততা ও বিশ্বস্ততা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-রহস্যের সারাৎসার। অভিজ্ঞতাকে তিনি কখনোই অতিক্রম করেন নি, যদিও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন নিষ্কাসনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদাই সচেতন ও সক্রিয়, সুদৃঢ় ও অব্যর্থ।

যখন তিনি এমনি ভাবে জীবনের একটা পথের মাথায় এসে পৌঁছলেন, স্বভাবতই তাঁর সৃষ্টির স্রোতও রুদ্ধ হ'য়ে এল। তখন একটা বাঁকের প্রয়োজন হ'লো তাঁর। নতুন আদর্শ, নতুন জীবন চাই সম্মুখে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন প্রাচ্যের বাণী প্রচার করতে। সঙ্গে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি। সে-পাণ্ডুলিপি দেখে রোদেনস্টাইন অভিভূত



হ'লেন, ইয়েট্‌স অভিভূত হলেন। তাঁদের উদ্যোগে 'গীতাঞ্জলি'র কবি রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন। 'গীতাঞ্জলি' ইউরোপের কাছে এক বিস্ময়। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে রোমান্টিক কবিরা আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সাযুজ্য সন্ধানে রত হন। ওয়ার্ডস্বার্থ জীবনের সমগ্রতা ত্যাগ করে তার একটা বিশেষ অংশে সান্ত্বনা খুঁজেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দিকের কাব্যে সেই সান্ত্বনাও তরল হ'য়ে এসেছে, অনুভূতির সেই গভীরতা নেই, আবেগের সেই তীব্রতা নেই। বায়ুর সঙ্গে প্রচণ্ড ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত উল্কার মতো বাস্তবের সংঘাতে শেলির চিত্ত জ্ব'লে উঠেছিল। সেই সংঘাত এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে সমসাময়িককালে অনেকে সেই আশ্চর্য কমনীয় যুবককে মূর্তিমান দানব ব'লে মনে ক'রেছিল। তাঁর কাব্যের পরিণতি বিপ্লবমুখী। অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তব জীবনের সাযুজ্যে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। নতুন ভাবে মনের মতো ক'রে আদর্শ অনুযায়ী জীবনকে গড়বার জন্য ওই বাস্তবকে ভেঙে মিশমার ক'রে দেওয়ার বজ্র-প্রস্তাব তাঁর কাব্যে প্রচ্ছন্ন। বায়রণও বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর বিদ্রোহের তেজ ক্ষ'য়ে আসছিল। এমন কি সন্দেহ হয় তিনি যেন একটু-একটু ক'রে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলেন। আর কীট্‌স উড়ে গেলেন, বাস্তব ছাড়িয়ে, স্বপ্নের আকাশে। এই সাযুজ্য সন্ধানে ব্রাউনিং খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু পৃথিবী তখন দ্রুত সংকটের মুখে এগিয়ে চ'লেছে। সেই দ্রুতগতির সঙ্গে ব্রাউনিং তাল মেলাতে পারেন নি। ব্রাউনিঙের পর প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই সাযুজ্য সন্ধানই চলেছে ও তার ফলে জটিলতা বেড়েছে বৈ কমে নি। এই সময় 'গীতাঞ্জলি' একটা অত্যন্ত সহজ সমীকরণ ক'রে দিল বাস্তব আদর্শের মধ্যে। ফলে ইউরোপ অভিভূত হ'য়ে গেল। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে 'গীতাঞ্জলি'র যে তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল ইউরোপের কাছে তা ছিল না আবার ইউরোপের কাছে 'গীতাঞ্জলি'র যে-তাৎপর্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে তা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এবারের বিদেশ ভ্রমণ 'গীতাঞ্জলি'র তাৎপর্যের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহান। পথের মাথায় পৌঁছে যে-বাঁকের প্রয়োজন হ'য়েছিল, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে সেই বাঁকটা এল তাঁর জীবনে। প্রাচ্যের বার্তা শোনাতে গিয়ে প্রতীচ্যের আত্মা অনুভব করলেন তিনি। ইউরোপ ও আমেরিকা বস্তুর বন্ধনে জর্জরিত এ-কথা তাঁর মনে হ'লেও তাদের প্রাণস্পন্দনে তিনি রোমাঞ্চিত হ'লেন, তাদের জীবনের প্রবল বহমান ধারাতে অবগাহন ক'রে তিনি নতুন জীবন পেলেন, সঞ্জীবিত হ'লেন। এবং বহমান ব'লে তা শত মলিনতা সত্ত্বেও পবিত্র। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ জড়বাদের বিরোধিতা করতে-করতে নিজেই জড়পিণ্ডতে পরিণত হ'য়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে তাঁর চিত্ত বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক নতুন ভূয়োদর্শনে উদ্বুদ্ধ হ'লো, তাঁর সম্মুখে একটা রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। গতি আর প্রাণ তাঁর কাছে সমার্থক হ'লো। অতঃপর তিনি যে-কাব্য রচনা করলেন সেই 'বলাকা'-র মূল ভাবটি এই যে বিশ্বজগৎ যদি নিমেষের জন্য এই গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয় তবে 'তখনি চমকি উচ্ছি,য়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ-পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে'। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে 'বলাকা'-র ব্যাখ্যা ক'রে বলছেন, 'সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার

মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চ'লেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানিনে।'

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তা কখনো লক্ষ্যহীন নয়, উদ্দেশ্যহীন নয়। চলা আছে বটে, কিন্তু একটা কিছু লক্ষ্য ক'রে চলা। তাই তিনি বলেন, 'যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে'। এই গতি ও বিরতির কথা 'বলাকা'র পরবর্তী 'তালগাছ' কবিতাটিতে ব্যক্ত হ'য়েছে। মাটির সঙ্গে যার মাতৃত্বের বন্ধন সেই তালগাছ সারাদিন আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু হাওয়া যখন থেমে যায় আবার সে ফিরে আসে মাটি-মার কাছে। 'বলাকা'-তে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল চলার কথাই বলেছেন। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' যেতে হবে বটে, তবু সেই 'অন্য কোনোখানের'-র উদ্দেশ রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'-র যুগে পান নি। এ-চলার শেষে কী আছে সে-সম্বন্ধে তখন তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের জবানী উদ্ধার করি, 'আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলাম। এই কবিতাগুলি (অর্থাৎ 'বলাকা'-র কবিতাগুলি) আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি'। রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন ১৯৩০-এ যখন 'পূরবী' 'মহুয়া'র যুগ চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বরাবর প্রাতিস্বিকতা অভিমুখী ছিল বটে, কিন্তু সেই প্রবণতা এতদিনে 'পূরবী'-তে এসে পরিপূর্ণতা পেল, 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অন্তরের অক্লান্ত বিস্ময়' এই প্রার্থনা সত্য হ'য়ে উঠল। 'পূরবী'তে এসে রবীন্দ্রনাথ 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি'-কে 'নিগূঢ় ধ্যানের হাজি' থেকে সংগ্রহ ক'রেছেন। এ তাঁর দ্বিতীয় যৌবনের কাহিনী, এখানে কবি স্বয়ং লীলায় রত। প্রথম যৌবনের কাব্যে লীলা ক'রেছে জীবনদেবতা, সেখানে কবির অন্বিষ্ট ছিল নিছক সৌন্দর্য, পরিপূর্ণ জীবনকে গ্রহণের অভীপ্সা সেখানে ছিল না। এবারে আর সেই ভাবোচ্ছ্বাস নেই, সেই জীবনদেবতা নেই, সেই নিছক সৌন্দর্যবাস নেই। কবির ব্যক্তিরূপ এখানে নিঃসংশয়ে প্রকাশিত, যেমন 'ক্ষণিকা'-তে। কিন্তু 'ক্ষণিকা'-তে সমাজ সংস্কার সব কিছুকে অস্বীকারের যে-প্রয়াস তাতে যৌবনের অহংকার আর নেতিবাদ আছে। 'পূরবী'র কবি অহংকারমুক্ত অচপল তন্ময় কণ্ঠে আপন ব্যক্তিসত্তাকে আপন অভিজ্ঞতা ও প্রেমকে রূপায়িত ক'রেছেন। বার্ধক্যে উপনীত হ'য়ে তিনি আবিষ্কার করলেন প্রেমের ফল্গুধারা তখনো তাঁর মধ্যে প্রবাহিত, তার মাধুরীতে তাঁর জীবন তখনো মহিমান্বিত। 'পূরবী'-তে নারী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছে, সে কেবল কবির প্রিয়া নয়, কেবল কবির লীলাসঙ্গিনী নয়, সে 'দেবতার দূতী', 'মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে' সে 'স্বর্গের আকৃতি' নিয়ে এসেছে (১)। যখন কবি আর তাঁর প্রিয়ার 'মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার' তখনো কবি বলছেন,

(১) এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক গ্যয়টের বিখ্যাত উক্তি, 'ফাউষ্ট'-এর শেষ দুই পংক্তি,



তবু শূন্য শূন্য নয়,
অগ্নিময়
ব্যথাবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

বিদ্রোহ নেই, অস্বীকৃতি নেই, আছে আপনার ব্যক্তিচেতনায় সুদৃঢ় বিশ্বাস। 'পূরবী'তে প্রেমই কবির জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই দর্শনের প্রতি গভীর প্রত্যয়ে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি প্রজ্বলন্ত। 'মহুয়া'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, 'প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার ফলে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস।' একদিকে রইল 'প্রণয়ের সাধনবেগ' অন্য দিকে 'প্রণয়ের প্রসাধনকলা' এই দুই নিয়ে 'মহুয়া'। 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র যুগ ভিন্ন বটে, কিন্তু ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে যে-প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে 'পূরবী'তে তার সৃষ্টিশক্তি উন্মোচিত হয়েছে 'মহুয়া'তে।

যখন কাব্যে 'পূরবী' ও 'মহুয়ার' যুগ চলছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর একটি দিক খুলে গেছে। সেটা তার চিত্র অঙ্কনের প্রতিভা। পাণ্ডুলিপির এলোমেলো কাটাকুটিগুলোকে একটা রূপের আভাস দেওয়ার সচেতন প্রয়াস অনেকদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। এ-ছাড়া ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক, জীবনস্মৃতিতে সে কথা বলেছেন। তারপরেও বহুবার তিনি ছবি আঁকবার চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু ছবি আঁকবার জন্য যে-আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন তার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবিশ্যি নিজের ছবিগুলো সম্বন্ধে একটা সংকোচ তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু তাঁর ভিতরে ভিতরে একটা প্রত্যয় নিশ্চয়ই ছিল ছবি সম্বন্ধে, নতুবা হঠাৎ অত ছবি আঁকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দুইহাতের হাত কাঁচা থাকা সত্ত্বেও রেখায় ও রঙে, বিশেষ করে রঙে, রবীন্দ্রনাথের যে-বলিষ্ঠতা ফেটে বেরয় তার পিছনে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় থাকতে বাধ্য। জাতীয় চেতনার মন্থন থেকে যে-ব্যক্তিচেতনা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র যুগে তা পূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই ব্যক্তিচেতনাই রবীন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনে আত্মপ্রত্যয় যুগিয়েছে। প্রাতিস্বিকতাজাত মনোভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টিতে সুপ্রকট।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাসমর পৃথিবীর ইতিহাসের সমস্ত পাতাগুলো এলোমেলো ক'রে দিল। এতোদিন ধ'রে মানুষ যেসব সত্য ও বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বাস করছিল চোখের

Das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan

'চিরন্তন নারী আমাদের নিরন্তর ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়,' স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে তারভূমিকা Intermediary-র। পৃথিবীতে সব সম্ভাবনা পূর্ণ হলেও প্রেমের সম্ভাবনা অপূর্ণ থাকে, তার পূর্ণতা স্বর্গেই সম্ভব।

পলকে সেসব ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশমার হ'য়ে গেল। মানুষ তখন আদিম যুগে ফিরে গেল। আদিমপ্রবৃত্তিগুলো মানুষের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সমাজ কেবল নীতিহীন মানুষের একটা সমষ্টি; তখন এলিয়ট জয়েস মান্ কাফ্‌কা প্রভৃতির হাতে ইউরোপের নতুন সাহিত্য ধীরে-ধীরে গড়ে উঠল। ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত সাহিত্য। কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিক কী করবে? সত্যের কাছে তার দায়, সে-দায় তাকে রক্ষা করতেই হবে। ব্যাধির চিত্র না এঁকে উপায় আছে যদি সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকাই তার ধর্ম হয়! অথচ তখনকার রবীন্দ্র সাহিত্য ব্যাধির দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। একমাত্র 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে অশুভ-শক্তির খানিকটা ছায়া প'য়েছে, কিন্তু সে-ছায়া স্পষ্ট হ'তে না-হতে মিলিয়ে গেছে। তাহ'লে কি রবীন্দ্রনাথ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হলেন? ভুলে গেলেন সত্যের প্রতি আনুগত্যেই শিল্পীর সার্থকতা?

না, বিচ্যুত তিনি হননি, সত্যই তাঁর পথ। বিস্মৃতি হননি যে যে-মুহূর্ত্তে তিনি শিল্পীসত্তার অধিকারী হয়েছিলেন সে-মুহূর্ত্তেই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীই তার প্রমাণ। সাহিত্যে সচেতনভাবে যেসব কুশ্রীতা ও বীভৎসতাকে তিনি পরিহার করেছিলেন সেগুলোই অকস্মাৎ তুলির মধ্য দিয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করল। নিজের ছবি দেখে তিনি নিজেই অবাক হলেন। তাঁর রুচি ও সৌন্দর্যবাদ কোনো দিনও এই সব চিত্রে সায় দেয় নি। সেজন্য নিজের ছবির ভালোমন্দ বিচারও তিনি করতে পারেন নি। যা মনে আসে তাই এঁকে গেলেন। সেখানে সচেতন চিত্তের নিয়ন্ত্রণ থাকল না। এদিকে মনে যেসব ভাবনা আসতে লাগল সেগুলো ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর, মনের অন্ধকার কোণে সেগুলোর বাস। আর আসতে লাগল প্রবল বেগে, দীর্ঘকাল সচেতন চিত্তের বশে থাকবার পর লাগাম ছিঁড়ে। এজন্য বিস্তর ছবি রবীন্দ্রনাথ তাড়াহুড়ো ক'রে আঁকতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনে কেবল আলোই সত্য নয়, অন্ধকারও আছে, তা স্থূল, বর্বর। 'আকাশপ্রদীপে'র 'যাত্রা' কবিতায় এই অন্ধকার চেতনার প্রভাবকেই রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ব'লেছেন। প্রথম মহাসমরের ফলে ওই অন্ধকার দিকটার পরে যে-বাঁধন ছিল ত আলগা হয়ে পড়ল। মানুষ হারিয়ে ফেলল তার সত্তার পরিচয়, তার স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসের আশ্রয়, তার বহুকষ্টার্জিত এতোদিনের সত্য। পরিচয়হারা সত্যহীন নিরাশ্রয় সত্তার ও অপলাপী সভ্যতার সমস্ত ভয়াবহতা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে অভিক্ষিপ্ত।

ছবি আঁকতে-আঁকতে রবীন্দ্রনাথের ভিতরে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। হাঁ, এটা বিপ্লবই বটে। চিত্রশিল্পে জীবনের স্থূলতাকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও তিনি কৈবল্যকে স্বীকার করলেন। 'কিন্তু গোয়ালার গলি' পর্যন্তও তিনি গেছেন, সেখানকার জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানি বুঝতে চেয়েছেন, যদিও শেষে তিনি হরিপদ কেরাণীর সঙ্গে আকবর বাদশার একটা সমীকরণ যেন জোর করেই ঘটিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও 'সোনার তরী' 'চিত্রা' থেকে 'পুনশ্চ' ও তৎপরবর্তী কাব্যের যে-তফাৎ সেটা জীবনের একটি খণ্ডাংশ থেকে পরিপূর্ণতার পথে বিস্তৃত। নতুবা কি সম্ভব 'ল্যাবরেটারি'র মতো পল্প? সোহিনীর মতো চরিত্র? তার ওই সংলাপ? আর তার মেয়ের ওই বর্ণনা? অবিশ্যি এতোদিন যে তিনি বৈকল্য স্থূলতা ও মানুষের অন্ধকার-চেতনাকে মেনে নিতে



পারেন নি তার মূলে একটা অতিনৈতিক সংস্কার ছিল, যেটা তাঁর অজ্ঞাতেই ছবি আঁকার বেলায় ভেঙে যায় এবং তাঁর ব্যক্তিচেতনাই তাঁকে ছবি আঁকবার আত্মপ্রত্যয় যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন ব্যক্তিচেতনার বন্ধনমুক্তির অপূর্ব কাহিনী। সমস্ত সংস্কার, সমস্ত অতিনৈতিকতা, সমস্ত বন্ধন একে-একে খ'সে পড়ছে। কী সাহিত্য সম্পর্কে, কী ধর্ম সম্পর্কে, কী সমগ্র জীবন সম্পর্কে।

ব্যক্তিচেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সমাজ-চেতনার পথে। ফলে উদ্বর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চেতনার উন্মেষ ঘটে। এবং এই উদ্বর্তনকে রুশ ভ্রমণ অনেকখানি সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিদেশভ্রমণগুলি বিশেষ তাৎপর্যময়। কেননা সেসব ভ্রমণের মানস-প্রতিক্রিয়া যেমন তাঁর কাব্যের গতিবিধির পরে আলোকপাত করে তেমনি তা তাঁর চেতনার উদ্বর্তনকেও সাহায্য করে। সমাজ-চেতনার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেতে চাইলেন জীবনের 'ছন্দ-ভাঙা অসংগতির মাঝে'। একদা মেঘদূতের বিরহের মধ্যে তিনি যে-পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তখন তা-ও তাঁর কাছে ফাঁকি বলে মনে হয়েছে। কেননা সেখানে সমাজজীবনের সুখদুঃখের কোনো ছায়া পড়েনি, তা রেডিয়োতে ভেসে-আসা নির্বিকার সঙ্গীতের ধারা মাত্র যার সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের কোনো যোগ নেই ('নবজাতকে'র 'সাড়ে ন'টা' দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে সমাজ-চেতনার আভাস আছে, তা যথার্থ কোনো মূর্ত্তিতে প্রকাশ লাভ করে নি। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজ-চেতনা খণ্ডিত হতে বাধ্য। তদুপরি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাও পরিপক্ক হয়নি ভারতবর্ষে। তা সত্ত্বেও তিনি যে সেই যুগেই প্রাতিস্বিকতাকে স্বচরিত্রে গঠন করে তাকে সযত্নে আমরণ পরিচর্যা করতে পেরেছিলেন তার কারণ পশ্চিমের শিল্পপ্রধান দেশগুলিও তাঁর সত্তার শিকড়ে রস যুগিয়েছিল। উৎপাদন প্রথার সঙ্গে শিল্পীচেতনার সম্পর্ক নিগূঢ় ও নিবিড়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণের ভিতর আপনার সার্থকতা খোঁজে, নতুবা তার উৎপাদনই বন্ধ হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা ঠিক তার বিপরীত, তা সর্বদা গতানুগতিক পন্থায় চলে। ফলে সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদীর মন নানা রকম কুসংস্কারে ও অনুশাসনে আচ্ছন্ন, প্রথাসিদ্ধ বিধিবিধান খাটিয়ে নেওয়ার সাহস তার নেই। রবীন্দ্রচেতনার ধারায় বিভিন্ন উৎপাদন প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যন্ত প্রকট। এবং তাতে একটা সুস্পষ্ট উদ্বর্তন আছে। তা নিরবচ্ছিন্ন ও মৌন। উদ্বর্তন যতখানি মৌল, শিল্পের সার্থকতাও ততখানি। রবীন্দ্রচেতনার উদ্বর্তন তাঁর শিল্পের অবিচ্ছিন্ন সার্থকতার ইতিহাস।

# হোলি

গোপাল ভৌমিক

দিও না আমাকে
আবীর দিও না আর ঃ
পারি না সইতে
রঙ খেলা ফাগুয়ার।
মনের ভিতরে
সুপ্ত যে জাগুয়ার
রঙের পরশ
পেলে হয় দুর্বার।

হৃদয়ে আমার
রয়েছে রঙের মেলা,
প্রতিদিন আমি
তাই নিয়ে করি খেলা।
জাফরাণী রঙ
গুলাল ও কুম্‌কুম্‌—
হাসায় কাঁদায়
পাড়ায় আবার ঘুম।

তাই বলি রঙ
দিও না, দিও না তুমি,
কি লাভ বাজিয়ে
অহেতুক ঝুম্‌ঝুমি
ঘুমানো শিশুর
শিয়রের কাছে বল—
জাগলে পাবে না
প্রবোধ দেবার ছলও।

# অজয়ের কাছে

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

শালবনে জ্বলন্ত লাফের
থাবা তাকে লুফে নিয়ে গেছে।
আলোর কিরিচে বেঁধা যে-ছায়া দুলেছে
ভুল তাকে কোরোনাকো ফের।

সে আজ বাতাস। তার
বালি নিয়ে গেরুয়া অজয়
বিকেলের বাউল। তন্ময়
মহুয়ার এ প্রায়ান্ধকার।

উত্তরফল্গুনী খুঁজে আর কোন ফল ?
মৃগশিরা, আর্দ্রা, শুধু ক্রমান্বিত স্মৃতি।
চৈত্রের ঝুমঝুমি গাছে স্মৃতির সম্প্রীতি ;
ও নয় পায়ের শব্দ নূপুরে চঞ্চল।

এ বসন্তক্ষিপ্ত দক্ষিণার
চাপা হাহাকারের বেলায়
যারা আর মাতে না খেলায়
খুঁজোনা তাদের তুমি আর।

ঝরেছে পিয়ালচূর্ণ চোখে,
নেই আর সেই কৃষ্ণসার।
এ বসন্ত বৃথা পর্ণিকার,
শোণছায়া বৃথাই অশোকে।

শালবনে জ্বলন্ত লাফের
ডোরাকাটা দুপুরের পর
খুঁজোনাকো সাণুদেশ হরিণের সময়ে
এ বাতাস দিনের শেষের।

## সেই রাত্রি রহস্য-ময়ূর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেই রাত্রি রহস্য-ময়ূর
শুধালো এখানে এসে আমারে নীরবে,
এখন প্রসন্ন হও, তুলে নাও হাতে
নিবিড় বীণার তারে বাজুক কানাড়া।

অন্ধকার একা হয়ে আসে,
তারাদের আলোর ধিক্কারে
শত তার খান-খান হয়ে যেন বাজে
হৃদয়ের বসন্তের গেরুয়া সভায়।
আমারে তুলিয়া লবে তাও একদিন
বলেছিলে ছায়া-ঘেরা সহস্র-যোজন পথ পার হয়ে এসে।
তারপরে বসে আছি কত রাত্রি-দিন,
প্রাচীন নবীন
সব কথা সব সুর সব কলরব
মোর কালে প্রহর গুণেছে।
একটি চুলের স্মৃতি কামিজের বুকে
সেই রাত্রি গেয়ে গেছে সেতারের সুরে।
তবু তো প্রসন্ন মনে না পেয়েছি দেখা
না শুনেছি প্রহরীর ডাক,
কেবলি রাত্রির মতো তারাদের মতো
প্রহর গুণেছি শুধু অন্তরার ঝোঁকে।

এখন আলোর দেশ থেকে বলো শুনি
তোমার রহস্যময় রজনীর কথা,
তোমার রহস্যময় জীবনের কথা,
নিবিড় বীণার তারে বাজুক কানাড়া।

## নীলাঞ্জনাকে

বেলু দত্ত রায়

এঁকোনা আঁখির ক্লান্ত কাজলে এঁকোনা—
কান্নার চোখ জল-ভরে অবনমিতা!
ছলোছলোছল আবেগোত্তাল নদীকে ও-বুকে ডেকোনা।
এনোনা নদীকে শিঞ্জিনী-পায়ে
ঝুমুর-ঝুমুর স্বপ্ন-ঝরানো, এনোনা।
আকাশের মেঘ-মল্লারে বাজে স্বর্গীয় সুর-কবিতা।

কদমের ডালে বেণু-রোমাঞ্চ শিহরণ বন-বাতাসে,
একা উচাটন গভীর গহন অজানিত মন
সারা আকাশেই কী যেন গভীর পিয়াসে
দৃষ্টি মেলেছে—কাকে খুঁজি, তাকে জীবনেও জানা হ'লোনা!

বাতাপী-লেবুর বন হ'তে মৃদু জোছনা ছড়ায় সুরভি
তোমার দু'চোখে দেখি জাগে আজ কী কবি!
বাজাবে কী গান—কী আছে দেবার—কী দেবে আমাকে বলনা
শুধু সারাদিন কান্না-ঝরানো দু'চোখে
হীরে-মুক্তোর নীলা-পান্নার ছলনা!

দুটি কালো-চোখে এতো কী কাজল মেখেছো
মেঘভারে নত সারা আকাশেই তোমার দৃষ্টি এঁকেছো।
হে কল-মুখরা, কেন তুমি তাকে আষাঢ়ে-শ্রাবণে ডাকলে!
এ-পাগল নদী, ঢেউ ক্ষ্যাপা, বাধ
থর্‌থর্‌থর্ সাগরের সাধ
মোহনার কূলে
কেন তাকে ডেকে আনলে!

# নতুন প্রেম

## সুনীল গুহ

ভাদ্রদুপুরের এই নীল তরল আকাশটার দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে—আকাশটা যেন উঠতে উঠে গেছে আরো খানিকটা। আর ঠিক সেই সময় কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নির্জন দুপুরের এই রেল-স্টেশনটাকে দেখলে মনে হবে বুঝি বিরাটকায় একটা জানোয়ারের মৃতদেহ।

মফঃস্বল স্টেশন। নাম উলুপুর। যুদ্ধের সময় বিশেষ প্রয়োজনের কৈফিয়ৎ দিয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেশনটা তৈরী করেছিলেন,—উলুপুর আর মানপাড়ার মাঝখানে। প্লাটফর্মও আছে, আর তারই দক্ষিণে এক কোণে স্টেশনের অফিসঘর। ওয়েটিং রুমও আছে একটা। মাইলখানেক দূর দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। লোকজন আর মালপত্র আনা নেওয়ার সুবিধার জন্যই তখনকার কর্তৃপক্ষ স্টেশনটা তৈরী করেছিলেন সন্দেহ নেই। আর একটা পাকা রাস্তা স্টেশন থেকে নদীর ধার অবধি। যেন অপরিস্ফুটিত একটি বোবা সঙ্কল্প। যেন গলা চেপে ধরেছে কেউ, যেন—অস্ফুট একটি গোঙানীর শব্দ টের পাওয়া যায়। বুঝি শিশুমৃত্যুর একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

সৈন্য এনে নিয়েও গাড়ীগুলি যাতায়াত করত তখন; এখন আর করে না। নানান রকম হৈ হুল্লোর লেগে থাকত তখন, প্রচুর লোকজনের যাতায়াত ছিল টোপের আশায়। স্টেশনকে কেন্দ্র করে এদিক ওদিক দু'চারটে দোকানও গড়ে উঠেছিল সেই সময়ারোহে! এখন সেগুলিকে আগাছার মত মনে হয়। ফাঁকতালে কখন মতিলালও হেঁকে বসেছিল চা মিঠাইয়ের দোকান। আসরটি কিন্তু জমেনি তেমনি,—সকালে বা দুপুরে, সন্ধ্যায় বা রাত্তিরে অথবা আরো যখন তখন।

—'যুদ্ধটা বড় অসময়ে শেষ হয়ে গেল বুঝলি, নইলে টাউন হয়ে যেত এই উলুপুর আর মানপাড়া।' আক্ষেপেই বোধ হয় বক্তার ধড়ফড়ে মাথাটা হেলে দুলে উঠল কয়েকবার। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল,—'আর অন্ততঃ দু'টি বছর যদি যুদ্ধটা থাকত তবে টাউন হয়ে যেত গঙ্গা অবধি, ঠিক কলকাতার মতন।'

—'উঃ—পালা এ জায়গার আবার উন্নতি, গাড়ীগুলি পর্যন্ত সব থামে না এখানে, নাক সিঁটকে যেন পেরিয়ে যায় শালারা,—তার জন্যে আবার এত আশা—ছঁঃ।' জবাব দেয় আরেকজন।

—'কোন আশাই নেই তবে বলছিস, কোন উন্নতিই হবে না?'

—'যুদ্ধের দয়ায় যেটুকু পেয়েছ তাতেই সুখী থাক বাবারা, আর চেয়ো না। এই যে পাকা সড়কটার ইট আর কাঁকড় খসে গিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে,—কেউ নজর দেয় একবার?'

একজন বেঞ্চিটার উপর শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কার বা গোয়াল কে-বা দেয় ঝোঁয়া, তা তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন বলত? চেপে যাও না বাপুরা,—একটু ঘুমিয়ে নিই দুপুরটায়।'



—'থাকি ত তুমি আর আমি তার জন্য আবার একটা বগল বাজিয়ে দিতে হবে নাকি?' একজন যন্ত্রের কথাটা বলেই সরে পড়ল। উপযুক্ত জবাব যেন; মুহূর্তখানেক থ' হয়ে রইল সবাই। তারপর এক এক করে তারাও সরে পড়ল যার যার নিজের কাজে। একটু পরেই বেঞ্চিতে শোয়া লোকটা নাক ডাকতে সুরু করে। আর বাইরে রৌদ্র-নির্জন দুপুরটা হা হা করতে থাকে।

সেই রৌদ্র-ঝাঁঝালো দুপুরে বেরিয়ে আসে চিমনলাল, সড়কটা ধরে এগোয় স্টেশনের দিকে। পুব দিকটা জুড়ে তাঁবু ভাঙা-পড়া খোলা আর টালির ছাদের নীচে ঘুরে-পড়া অনেকগুলি ঘর মিলে যে বস্তিটার সৃষ্টি করেছে,—সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে সে। লোকটা বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী বোঝবার জো নেই। একটা মিষ্টি হাসির রেখা লেগেই আছে মুখে ঠোঁট দু'টোকে জুড়ে। এই রুক্ষুরে পুড়লেও সে হাসি ম্লান হয় না। যেন ঝলমলিয়ে ওঠে আরো বেশি।

তখন সেই বস্তিটা ছাড়িয়ে স্টেশনমুখী সড়কটায় পড়ে মনে হবে, বুঝি শাসিয়ে আসছে রৌদ্রের তাপটা; আর এই দুপুরটা অজানা কারণে শোকাভিভূত পৃথিবীর একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের মত।

স্টেশনে ঢুকে সরকারী জামাটা ঝেড়িয়ে নিল গায়ে, তারপর দৃষ্টিটা তুলে ধরল দূর থেকে দূরান্তরে, লাইনটা যেতে যেতে যেখানে একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে, অথবা আরো দূরে সেই বিন্দু ছাড়িয়ে যেখানে একটা খাদের মত, অথবা নীল আকাশটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে নেমে গেছে—বোধ হয় মাটির থাকবেনে—সেই দিকে।

দুপুর বেলায় স্টেশনটার কোন আকর্ষণই নেই, যাত্রীর আনাগোনাও নেই; দুপুর বেলায় গাড়ীগুলি থামে না এখানে, প্রয়োজনও নেই বোধ হয়।

আছতে চিমনলাল পয়েন্টস্‌ম্যান, এবং স্টেশনে স্টেশন মাষ্টার ব্যতীত সে দ্বিতীয় ও সর্বশেষ ব্যক্তি। কিন্তু স্টেশন মাষ্টার নরহরিবাবু একটু আত্মভোলা ও বে-হিসেবী গুণ্ডায় সে-ই সব।

দুপুর বেলায় দু'চারটে লোক বসে বা ছড়িয়ে থাকে এদিক ওদিক শুয়ে। রোজই এ দৃশ্য দেখে সে। দেখতে দেখতে যেন ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কাছে। আজকের দুপুরটা বুঝি সেই জন্যই ওর কাছে অস্বাভাবিক মনে হ'ল। একটি লোক নেই আজ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অথবা এদিক ওদিক। সেই রোদ ঠেলে এগিয়ে আসেনি বোধ হয় কেউ। 'না কোথায় যেন ভেগেছে শালারা সব।' আপন মনেই বিড় বিড় করে ওঠে একবার। তারপর একবারে ইটের পর্দা দিয়ে ঘেরা মেয়েদের ওয়েটিং রুমটাও দেখল উঁকি মেরে। সেখানেও কেউ নেই। এগিয়ে এসে টিকেট দেওয়ার ছোট ফোকরটা দিয়ে উঁকি মারল আরেকবার অফিস ঘরটার ভিতরের দিকে; হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, সস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মধ্যে ডুবে আছেন নরহরিবাবু ওখানে অফিস ঘরের মধ্যে; একটি অনড় অচেতন জড় পদার্থের মত। নাকের ডগায় চশমাটা এমনভাবে লাগানো যে, মনে হবে বুঝি ঝুলে পড়েছে স্বস্থান থেকে। আর একটু বাদে সেখানেও থাকবে না বোধ হয়। দেখল তাকিয়ে আরেকবার,—কুচকুচে কালো মানুষটা, ভুঁড়িটা একটু অস্বাভাবিক রকম বড়, সব সময়েই যেন দেহটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে থাকতে চায়। চব্বিশ ঘণ্টাই সরকারী কোর্টটা

গায়ে থাকে নরহরিবাবুর। মাঝে মাঝে খুলে শুধু দেহের ঘামাচি বা কোটের ছারপোকার বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হ'তে হয়।

মুখের উপর হাসির রেখাটা লেগেই আছে তেমনি চিমনলালের। অফিস ঘরে ঢুকে তুলে নিল সবুজ পতাকা, বেরবার মুখে একবার তাকালো নরহরিবাবুর দিকে, নড়ে চড়ে উঠলেন একবার নরহরিবাবু। যেন 'টের পেয়েছি গাড়ীটা 'পাস' করিয়ে দিয়ে এসো—এই তার অর্থ।

দূর থেকে দেখা গেল ডাউন সাতাশের ধোঁয়া, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো গাড়ীটা। সবুজ পতাকাটা হাতে করে তুলে দাঁড়িয়ে রইল চিমনলাল। বিষম একটা কাঁপুনীতে থর থর করে কেঁপে উঠল প্লাটফরমটা। ডাউন সাতাশ 'পাস' করল। পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে রইল সে তেমনি খানিকক্ষণ। তারপর পতাকাটা লাঠির সঙ্গে মোড়াতে মোড়াতে চোখ পড়ল, ওভারব্রীজটা যেখানে এসে প্লাটফরম ছুঁয়েছে সেখানে। সিঁড়ির পিছনে এক চিলতে ছায়া, কে যেন মথল করে আছে সেটুকু। নড়েচড়ে উঠল যেন দেহটা একবার। এগিয়ে গেলো কাছে, দেখলো লোকটাকে, —আর কেউ নয় ওদের মদন। থমকে রইল মুহূর্তখানেক। হাসির রেখাটা আরো একটু প্রসারিত হ'লো মুখের উপর; নিঃসাড় একটা জীবের মত কাত হয়ে আছে মদনের দেহটা, একটু রাগও যেন হ'ল হঠাৎ চিমনলালের; পতাকা জড়ানো হাতের লাঠিটা দিয়ে খোঁচা মেরে ডাকল,— 'এই মদনা, ওঠ্ বলছি,—ওঠ্।'

ধড়মড় করে উঠে বসল মদন, এদিক ওদিক তাকালো একবার; পাসিয়ে দিল যেন ঝাঁঝালো রোদটা সে দৃষ্টিকে। রক্তিম ক্লান্ত চোখ দুটি যেন খসে পড়তে চায়, বলে,—'কত বেলা হবে রে?'

—'আরে দিন কাবার হয়ে এলো, দেখগে যা, মরণীও শুকিয়ে আছে তোর জন্যে।'

মরণী মদনের বৌ। একটা হাই তুলল মদন। বলে,—'দরদে বুঝি! আমার জন্যে ওর দরদ আছে বলছিস?'

—'আলবৎ আছে,—শালা মুকখু তুই বুঝবি কিরে?'

অকস্মাৎ যেন চাবুকের ঘায়ে আচ্ছন্নতা কেটে যায় মদনের। লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরে চিমনলালকে। বলে,—'না রে না, এমন দরদী আমার কেউ নেই যার পরাণটা কাঁদবে আমার জন্যে।'

প্রত্যুত্তরে চিমনলাল একটু হাসল শুধু।

আবার বলে মদন,—'এই সাত বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি নবীন হালদারের পিছে পিছে,— রাত বিরেতে মোট বয়ে বেড়িয়েছি; একবার মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে না, একটা পাট দিলে না আজ অবধি, কেবল খাটিয়েই নিল রে।'

—'ও বুড়িয়া নবীন হালদার বড্ড বেইমান লোক আছে।' বলতে বলতে মদনের লম্বানো হাত দুটো নিজের দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'সেইত কবে বেরিয়েছিস, বলে যাবি ত কোথায় যাস, কবে আসবি, না, যত সব ইয়ে, চল, চল, আগে মরণীকে দেখা দিবি তারপর সব বাতচিত হবে।'



মনের মধ্যে একবার সেই কাহিনীটা নড়েচড়ে ওঠে চিমনলালের। দেশের রীতি অনুযায়ী বছর দশেক বয়সে বিয়ে হয়েছিল ওর, তারপর দেশ গাঁয়ের মায়া ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে ছুটে এসেছিল বাংলায়। একটা মহাযুদ্ধসহ কেটে গেল কুড়িটা বছর। সেই কুড়ি বছর আগের স্মৃতি ভেসে ওঠে আজকের এই অশান্ত মনটায়।

এই নিস্তব্ধ দুপুর অথবা কোন রাত্রির শূন্যতার মধ্যে বিভূষিত পোড়া মনটা কতবার ওকে নিয়ে চলে গেছে সেই সরল পাড়াগাঁয়ের জীর্ণ কুটীরে লুকায়িত সেই 'বঙ্গ'টির কাছে। আর আসন্ন বড়ের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধতাটুকু চেপে থাকে বুকের মধ্যে। ঝড় আসে না তবু, হাল্কা হয় না বুকটা।

আর মদন,—যুদ্ধের বাজারে সাহেব সুবোদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে,—বেশ কামাত তখন। যুদ্ধটা শেষ হ'তেই জুটে গেল নবীন হালদারের বিখ্যাত যাত্রাদলের সঙ্গে। নবীন নাকি ওকে বলেছিল পার্ট করিয়ে করিয়ে ওকে একজন সেরা ওস্তাদ বানিয়ে দেবে, তারপর দেবে ওকে চালান দিয়ে কলকাতায়, প্রচুর খ্যাতি হবে, আর হবে টাকা।

সে সব কথা আজো মদনের মনে পড়ে, নবীন হালদারের সম্বন্ধে যখনই কোন সন্দেহ মনের কোণে উঁকি মেরেছে তখন, অথবা কোন সময় চলে এসেছে কোন অভিমানে নবীনের সঙ্গ ছেড়ে তখন, এসে মনে পড়েছে ঐ কথাগুলি,—আবার ছুটে গেছে নবীনের কাছে, গিয়ে বলেছে,— 'মাষ্টার কর্তা, এইবার ক্ষমা দাও, আমি আর পলাব না।'

তারপর হয়ত যাত্রার সরঞ্জাম ইত্যাদির বোঝাটা মাথায় তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করেছে, —'আজ কোথায় পালা হবে?'

—'এখন রাখ্।' জবাব দিয়েছে নবীন।—মশটা নাগাদ রওয়ানা হ'ব, যেতে হবে সেই কাটোয়া, বিকেল হতে হতেই পৌঁছে যাব আর কি। এখান থেকে বারো মাইল মাত্তর।'

দু'জনে এগিয়ে আসে ষ্টেশনের অফিস ঘরটার দিকে। চিমনলাল মদনের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে আসে ওকে, অফিস ঘরটার দোরে দাঁড়িয়ে লাঠিতে মোড়ানো সবুজ পতাকাটা ছুঁড়ে দিল ঘরের মধ্যে, তারপর নরহরিবাবুকে উদ্দেশ্য করেই বলল,—'হাম ঘুমকে আতা হায় মাষ্টারবাবু।'

অসাবধানেই বোধ হয় কথাগুলি হিন্দিতে বলল চিমনলাল।

ঘরের ভিতর নরহরিবাবু সে কথা শুনল কিনা বোঝা গেল না। উপুড় হয়ে ঝুঁকে আছেন তেমনি বইটার উপর। বুঝিবা কাহিনীর রসে নিজেই রসাল হয়ে উঠেছেন এতক্ষণে।

দু'জনে প্লাটফরম থেকে নেমে এগুতে থাকে সেই সড়ক ধরে। হঠাৎ মদন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে, 'না, চিমনলাল তুই আমাকে ছেড়ে যে, আমি চলে যাব এখান থেকে দূরে, মরণীকে শুধু খবরটা দিস, আমি ভাল আছি।'

মদনের কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগল চিমনলালের কাছে। প্রবাহমান মাতলা হাওয়াটা থাক খেতে খেতে যেন হারিয়ে যাচ্ছে কোন অতলান্তে। আর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা ব্যর্থ নিশ্বাস, মিশে গেল হাওয়ার সেই ঘূর্ণিচক্রে।

তবু যেন চাপা একটা কৌতুক উঁকি মারে চিমনলালের মনের কোণে, বলে, 'ঘর ছেড়ে বিবাগী হইবি বলছিস্ ?'

—'হ্যাঁ' চিমললাল ; এত বড় দুনিয়াটায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।' বলতে বলতে সেই ক্লান্ত লাল চোখ দুটো আরো বড় হয়ে ওঠে মদনের।

সড়কটা ধরে আবার দু'জনে এগুতে থাকে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায় দু'জনের। তারপর মদনই আবার সুরু করে, 'বুঝলি চিমনলাল ?'

—'কি ?'

—'নবীনদার পরাণে বড় মায়া, কাছে গেলে আপনা থেকেই মনটা কাবু হয়ে যায়।' আকস্মিক নরম কণ্ঠস্বরে একটা অনুভূতির চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—'তাই বুঝি সাত বছর ধরে কেবল ঘানি ঘুরিয়েই বেড়ালি ?" একটু মুচকি হেসে জবাব দেয় চিমনলাল।

—'তুই এসব বুঝিস্ না, বুঝলি ?"

এবার হো হো করে হেসে উঠল চিমনলাল। সে হাসিতে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। 'তুই আমাকে বলছিস আমি মানুষ চিনি না!' বলেই আবার হো হো করে হেসে উঠল।

ওদের দু'জনকে ঘরে ঢুকতে দেখে ঝলমলিয়ে উঠল মরণীর মুখটা। বুঝি রোদ্রটাই ঝিলিক মেরে গেল একবার। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করে নিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল, 'কোথা থেকে পাকড়ালে মানুষটাকে ?

—'নবীন শালার ফাঁকা মাঠ থেকে।' জবাব দেয় চিমনলাল, 'ও শালার কাজ ফুরোলইত আমাদের মদনের কাজ ফুরোয় ; তখন মদন একা, তারপর পাকড়ালেই হল।'

—'ও, তাই বল।' একটা মুচকি হেসে জবাব দেয় মরণী। বলে, 'নইলে আবার ও মানুষের ঘরমুখো হ'তে হচ্ছে করে নাকি ?' চিমনলালের কথার জবাব হলেও মরণী একটা কটাক্ষ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল মদনের দিকে। একটু থেমে আবার বলে, 'যাক্ তবু ত তুমি আমার একটা উপকার করলে, পুণ্যি জোগাচ্ছ বুঝি পরকালের জন্যে ?'

এবার চিমনলালও সম্বন্ধে হেসে উঠল, একটু থেমে তারপর বলল, 'এই গুপুর রোদে ষ্টেশনে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল।'

—'ও, তবে এলো কেন ; সেখানে থাকলেই পারতো।'

এতক্ষণ মদন কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়িয়েছিল এককোণে, এবার যেন ক্ষেপে উঠল হঠাৎ, 'দেখ মরণী ভাল মুখে জবাব দিবি বলছি, নইলে এবার যদি বেরোই ত ফিরবই না আর, এই বলে রাখছি।'

'যাবে কোন চুলোয় শুনি, ঘুরে ফিরে আসতে হবে এই মরণীর ঠাঁইয়েই।'

—'হা হা।' গোঁফের উপড় হাত বুলিয়ে জবাব দেয় চিমনলাল, 'সারা জন্ম মোট বয়ে বয়ে বেড়ালেও নবীন একটা সৈনিকের পাটও দেবে না, ও শালা বহুত বেইমান লোক।' একটু



থেমে মরণীকে লক্ষ্য করে আবার বলে, নে নে ওকে খাইয়ে দাইয়ে তাজা করে দে, তারপর একটা নকরির তদ্বির করতে হবে ত ? যা যা।' বলে ঠেলে দিল মদনকে মরণীর দিকে।

রুখে দাঁড়ায় মদন, বলে, 'না, আমার সঙ্গে ওর বনবে না, আমি চলে যাব আমাকে ছেড়ে দে।' বলেই মদন এগিয়ে গেল দরজার দিকে আর সেই মুহূর্ত্তে ওর হাতটা চেপে ধরল চিমনলাল, বলল, 'এই, বেয়াদপি করবি না বলছি।'

এবার যেন আগ্নেয় জ্বলে উঠল মদন ; হ্যাচ্‌কা টান মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল চিমনলালের হাত থেকে, তারপর পায়ের কাছ থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মরণীর দিকে। গায়ে লাগল না মরণীর, প্রায় পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেলো, গিয়ে লাগল ওদিককার বেড়ায় গায়। গর্জ্জে উঠল চিমনলাল, 'এই উল্লুক খবরদার বলছি।' বলেই রুখে দাঁড়াল মদনের সামনে যেয়ে। ওদিকে মরণী বিড়বিড় করছে, বুঝি চৌদ্দগুষ্ঠির উদ্ধার করছে, নবীনের আর মদনের।

—'ভাখ, ভাখ, আমি কিন্তু ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব বলছি।' মদন গর্জে ওঠে।

—'ও আমার বীর পুরুষ রে, ক্ষমতা ত কত, হু—।' জবাব দেয় মরণী।

—'এই চুপ কর বলছি।' এবার যেন চিমনলালও ক্ষেপে ওঠে। 'তোদের জন্যে কি ভদ্দর লোকের পাড়ায় বাস করা যাবে না।'

—'কেন চুপ করব।' জবাব দেয় মরণী, 'যার মুরোদ নেই খেতে দেবার তার জ্বালা সইব কেন ?'

—'তবে কর তোদের যা' ইচ্ছা, দুটোতে দুটোকে খেয়ে মর।' বলতে বলতে বেরিয়ে যায় চিমনলাল ঘর থেকে।

এ জ্বালা যেন সইবার নয়। আজ সাত বছর ধরে এ জ্বালা সইছে চিমনলাল। মদন ঘুরে বেড়ায় নবীন হালদারের পিছে পিছে, আর চিমনলাল তার ঘর আগ্‌লায়। কি জানি কেন তবু পারে না সরে যেতে। কতবার মনে হয়েছে ফিরে যাবে পশ্চিমে নিজের দেশ গাঁয়ে। ফিরে যাবে তার 'বহু'র কাছে। রোজগারের আশায় এসেছিল এ দেশে, এই কুড়ি বছর বাংলা দেশে এসেছে সে, আর এই পনেরো বছর ধরে এ চাকরীতে বহাল আছে সে। এখানে এসে জুটেছিল মদনের সঙ্গে, তারপর দু'জনে মিলে যুদ্ধের বাজারে কামাই করেছে প্রচুর। মিলিটারী সৈন্তরা আসত যেত এখান দিয়ে। ওরা ওদের বলত 'যুদ্ধের সাহেব', যাতায়াতকারী সৈনিকদের কাছ থেকে সেলাম ঠুকেই আদায় করেছে পয়সা নয়ত টাকা। এক একদিন রোজগারের বহর দেখে ওরা অবাক হ'ত দু'জনেই ! তারপর দু'জনেই হাসত, খুব করে হেসে নিত ওরা। এক একদিন হাসির মধ্যেই মদন বলে উঠত, 'শালা যুদ্ধের সাহেবগুলো এত বোকা !'

চিমনলাল শুধু হাসত।

যুদ্ধের আগে দেশে টাকা পাঠাত মাসে মাসে। যুদ্ধের সময় পাঠাত সপ্তাহে। তারপর সৈনিকদের গাড়ীগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর এলো না। সপ্তাহে টাকার যে পোঁটলাটা

তুলে দিয়ে আসত ডাকঘরে সে পোটলাটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে গেল মাসে মাসে, তারপর এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে।

আর এ ক'বছরে মদন কতবার যে পালিয়েছে, তা হিসাব করে সঠিক বলা চিমনলালের সাধ্য নাই। ওকেই বেরিয়ে খুঁজে আনতে হয়েছে, নয়ত কখনো কখনো নিজেই ফিরে এসেছে মদন। মদনের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অবাধ্যতার সবটুকু জ্বালা নিজের উপর নিয়েছে সে। এ ঘরের মায়া তাকে আটকে রেখেছে; পোষ-মানা জীবের মত ঘুরে ঘুরে এখানেই সে ফিরে আসে।

সেদিন সে বোঝাতে চেষ্টা করছিল মদনকে,—তার ঘরের কথা, কাজকর্ম্মের কথা আর মরণীর কথা। বলেছিল,—'কাজকর্ম্মের একটা চেষ্টা কর—ঘরের দিকে মন দে।'

একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল মদন, 'আমাদের নবীন মাষ্টারকে চিনিস ত, তিন তিনটে বিয়ে করেছিলেন তিনি।'

চিমনলালের বিস্মিত চোখ দুটি অপলকে চেয়ে থাকে।

—'সব বউদেরই বিদায় করে দিয়েছেন তিনি।' সগর্ব্বেই যেন বলে মদন। 'তিনি কি বলেন জানিস? বলেন,—ঘরের দিকে মন থাকলে জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না; সত্যি ভাই,—তামাম দেশশুদ্ধ লোক নবীন মাষ্টারকে আজ চেনে।'

প্রত্যুত্তরে কিছুই বলেনি সেদিন চিমনলাল; ও সব খ্যাতি-ট্যাতির ব্যাপার ওর তেমন মনে ধরে না। বোঝেনা বলেই হয়ত চুপ করে গিয়েছিল। কথা বলে নি আর।

আর ঠিক সেদিন রাত্রেই মদন পালিয়েছিল আবার। তার প্রায় তিন মাস পরে মদন ফিরে এসেছিল। মাঝখানে একদিন মরণী বলেছিল, 'তোমার ত খাচ্ছি, শোধ হবে কি করে তাই ভাবছি।'

—'তবে না খেলেই পার।' হেসেই জবাব দিয়েছিল চিমনলাল।

—'তা-ও যে পারি না, মাঝে মাঝে মনে হয় ফাঁকির সংসার করছি, কিন্তু তুমি এসে দাঁড়ালে একটা ভরসা পাই তবু।'

চিমনলাল শুধু হেসেছিল একটু।

মরণী আবার বলেছিল, 'পৃথীমিতে আমার আর কে আছে বল, তুমি যদি না থাকতে এদ্দিনে হয়ত বিষ খেতাম,—নয়ত দিতাম গলায় দড়ি।'

আঁৎকে উঠেছিল সে, নিজেকে সংযত করে জবাব দিয়েছিল—'খবরদার বলছি, দোহুরি বার ও কথা বলবি ত ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির অপলক হয়ে যায় মরণী। তারপর সরে আসে চিমনলালের একেবারে কাছটিতে। এত কাছে যে, নিঃশ্বাসের তপ্ত হাওয়াটাও গায়ে লাগছে তার। আপাদমস্তক শিহরণের একটা তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল; সে তরঙ্গে বুঝি পৃথিবীর পার ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাচ্ছিল চিমনলালের পায়ের নীচে। মরণী বলেছিল তখন,—'নবীন মাষ্টারের ভক্ত ত আমাকে চিনলনা, তুমিও কি আমাকে বোঝবে না।'



সভয়ে যেন কে কেঁদে উঠেছিল চিমনলালের অন্তরে। বলেছিল,—'মরণী এটা মদনের ঘর। ধর্ম্ম খোয়ালে যে পাপ হবে।'

কি জানি কেন খিল খিল করে হেসে উঠেছিল মরণী, তারপর হাসি থামিয়ে বলেছিল, 'বলছি কি, কোন দিক দিয়ে পিথিমির কোন দেনাই শোধ করতে পারলাম না, দেওলিয়া হয়েই ত বেঁচে রইলাম।'

—'কোথায় কোন দেনা আছে বল,—তোর হয়ে আমি শোধব সে দেনা।'

আবারো হেসেছিল মরণী; বোধহয় চিমনলালের বোকামীতে। দুষ্টু মিভরা টানাটানা চোখে বলেছিল, 'কথা দিচ্ছ শোধ করে দেবে সব?'

—'হাঁ, হাঁ, জরুর; এ জন্মে না পারি আর জন্মে শোধব।"

ঠোঁটের সাগরে হাসির বন্যা, আরো হেসেছিল মরণী তখন। তারপরেই আরো কাছে এসে দাঁড়াল, মিশে যেতে যায় যেন ওর দেহের সঙ্গে, বলেছিল,—'এখনই তবে আমাকে নিয়ে চল। চল যাই, তোমার সঙ্গেই চলে যাব।"

চিমনলালের চোখের সামনে পৃথিবীটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেন সেদিন। তারপর কি হয়েছিল আর মনে নেই। সেই মুহূর্ত্তে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল সেখান থেকে। মরণীর সে কথার যেন কোন জবার সে দেয় নি। সে মুহূর্ত্তটি আজো সে ভুলতে পারে না। ভেবেছিল,—সেদিন রাত্রেই পালাবে। মদন আর মরণীর মাঝখানে নিজেকে কেন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল ওর। চলেই হয়ত যেত সেখানে,—যেখানে, হয়ত বা তারই প্রতীক্ষায় কাল গুণছে পল্লীর বনানী ঘেরা বিরহের আহত কুঞ্জে একটি নারী। তার বউ দুলিয়া।

কিন্তু সে যাওয়ায় বাধা দিয়েছিল নাকের ডগায় চশমাওয়ালা ষ্টেপন মাষ্টার নরহরিবাবু। বলেছিলেন এখন কি একটা যাওয়ার সময়? সবে ত মাত্তর যুদ্ধটা শেষ হ'ল, এখন ছুটি চাওয়ার মানে কি, বুঝিস? শালার নোকরিই খতম হো যায়েগা—বুঝলি?' কথার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিলেন। সরে এসেছিল সে নরহরিবাবুর কাছ থেকে বিনা ছুটিতেই। কি জানি কিসের আকর্ষণে আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মরণীর সামনেই। সেই থেকে তারপর কেটে গেল আরো ক'টা বছর।

এমনি ভাবতে ভাবতেই তার বিকেলটা গেল সেদিনের। বিকেলের গাড়ীগুলিও পাশ করল সবুজ পতাকা দেখিয়ে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার গাড়ীটা গেলেই আবার দুঘণ্টা কোন গাড়ী নেই। আজো তার মনের মধ্যে সেই মতলবটা দানা বেঁধে উঠেছে,—সে পালাবে। সে পালালেই যেন এরা শান্তি পায়। এমনি আরো অনেক চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ আপ গাড়ীটার আলো দেখা গেল, এসে দাঁড়ালো সে একেবারে প্ল্যাটফরমের কিনারে। গাড়ীর হেডলাইটের আলোটা পড়ে চিক্‌চিক্ করছে লাইনদুটো। হঠাৎ নজরে পড়ল লাইনের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা মানুষ। চলার প্রকৃতি ও দেহের আকৃতিতে লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র দেরী হ'ল না তার, ঝুপ করে লাইনের উপর লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে চলল, ছুটল সেইদিকে; গাড়ীটাও এগিয়ে আসছে;

গাড়ীটা থেকে একটা শাসানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। বোধ হয় পারবে না, পারবে না ওকে বাঁচাতে। গাড়ীটা এগিয়ে এসেছে আরো। লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখী পড়ে সরে যেতে পারছে না বুঝি আর! মৃত্যু যেন ওকে পেয়ে বসেছে। গাড়ীটা এসে পড়েছে প্রায় কাছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চিমনলাল লোকটাকে জড়িয়ে ধরে ডানদিকের ঢালু জায়গাটা নিয়ে জড়াজড়ি করে গড়িয়ে নীচে পড়ল দু'জনে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন আক্রোশের দৈত্যমূর্ত্তির মত গাড়ীটা পাস করল সেখান দিয়ে।

চিমনলালের মনে হ'ল যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছে মদন। মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিল দুপাটি দাঁত এসে যেখানে মিশেছে সেখানে। হ্যাঁ, সত্যি ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মদন। উঠে দাঁড়াল সে। কি যেন ভাবল এক মুহূর্ত্ত। তারপর মদনের অচেতন দেহটা তুলে নিল কাঁধে, ঢালু জায়গাটা বেয়ে উঠে এলো আবার লাইনের উপর; তারপর ষ্টেশনের দিকে না গিয়ে অপর দিকের ঢালুটা বেয়ে নেমে গেল নীচে। অদূরেই একটা পুকুর, তারই ইঁট বাঁধানো সিঁড়ির উপর শুইয়ে দিল মদনকে। নিজের কাপড়ের খুঁট ভিজিয়ে ভিজিয়ে জল দিল ওর চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে। চারিদিকে অতিকায় অন্ধকারটার মধ্যে যেন বহুদিনের সঞ্চিত হাহাকার জেগে উঠেছে আজ!

মদন কখন চোখ মেলেছে টের পায়নি সে। হঠাৎ কথা বলে উঠল মদন, 'চিমনলাল তুই কেন আমাকে মরতে দিলি না আজ বল।'

অন্ধকারটাই বুঝি হঠাৎ গলা চেপে ধরল চিমনলালের। তবু যেন জোর করেই সে বলে, 'তুই কেন মরতে গেছিলি মদন?'

—'কি হবে আর বেঁচে থেকে বল।' ধরা গলায় জবাব দেয় মদন। আমার যে কেউ নেই, তামাম দুনিয়ায় কেউ যে আমাকে বোঝলনা রে, আমি কি জন্যে বাঁচব বল্?'

সেই অন্ধকারটা যেন আরো এগিয়ে আসে দু'জনের চারিদিক ঘিরে। চিমনলাল কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর কথা বলল।

—'কেউ তোকে ভালোবাসে না বলছিস্?'

—'না, না, কেউ না।' বিকট চিৎকারে যেন ভেঙেচুরে ছিটকে পড়তে চায় অন্ধকারটা। 'এমন কি মরণীও না।' মদন তার কথা শেষ করল।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল চিমনলাল, 'কালা বেইমান, তুই কি জানিস, মরণী তোকে ভালোবাসে কি-না।"

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব জানি।"

—'তুই মরতে গেছলি আজ একদিন, মরণী গেছল হাজার দিন।'

—'অ্যাঁ!' প্রত্যুত্তরে মদনের অন্ধকার-মাখা মুখটা থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে শুধু।

পৃথিবী থেকে যেন দূরে সরে এসেছে দু'জনে। চারিদিকের নিস্তব্ধ অন্ধকারটাও যেন



পৃথিবীকে সরিয়ে রেখেছে দূরে। আর সেখানে যেন আজ ওদের দুজনের বোঝাপাড়ার একটা সুযোগ।

পরদিন আর ষ্টেশনমুখো হয়নি চিমনলাল। মদনের ঘরেও না। সারাদিন কাটালো দূরে গঙ্গার ধারে বসে বসে। দিন কাটালো, আর ভেবে ভেবে মন ভরালো। আর নয়। এবার যাবে সে দেশে। শেষ হয়ে গেছে এখানকার জলবায়ু। শেষ হয়ে গেছে যেন বাঁকা সরু গলিপথ। সাধারণ সোজা সড়ক ধরে এবার চলবে সে।

সন্ধ্যার পর উঠে এলো সে সেখান থেকে, আজই চলে যাবে সে। সামনের জংশন ষ্টেশন থেকে গাড়ী ধরতে হবে। এখান থেকে ছয় মাইল। যাবার সময় একবার শুধু দেখা করে যাবে মরণী আর মদনের সঙ্গে।

সন্ধ্যার একটু বেশী পরেই রওয়ানা হ'ল বস্তিটার দিকে। মদন হয়ত বা বাড়ী নেই, কিন্তু মরণী আছে। সে তাকে আবার হয়ত আটকাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দেবে আজ, দেশে তার 'বহু' আছে, তার দাবীই বা কম কিসে? হ্যাঁ, এটাই মরণীকে জানিয়ে চলে যাবে আজ সে।

বস্তির ভিতর ঢুকে পা টিপে এগুলো সে মদনের ঘরের দিকে। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো শেষে। সেখান থেকে দরজার একটু ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যেটা। একটা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। দেখল সেই ফাঁকটুকু দিয়ে মদন আর মরণী হাস্‌ছে। কিছুক্ষণ হেসে হেসে থামল ওরা। হাসি থামিয়ে মদন বলল ষ্টেশন মাষ্টার নরহরিবাবুর কথা। 'বুঝলি, মাষ্টারবাবু বললেন, বেটা পালিয়েছে নিশ্চয়, তুই কাজ করবি ষ্টেশনে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। বাস্ আর কথা নেই, আজ থেকেই সুরু করে দিলাম কাজ।' একটু থামল মদন, তারপর আবার বলল, 'একটু বাদেই আবার সাড়ে ন'টার গাড়ী পাস করাতে যেতে হবে।

—'কিন্তু—'

—'কিন্তু আবার কি, তুই দেখিস আর পালাব না আমি, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।'

সত্যি মদন গা ছুঁ'ল মরণীর।

—'তবু কি ভাবছি জানো?' বলল মরণী।

—'কি?'

—'এমন ভাল মন কি হবে তোমার।'

—'ঠিক হবে মরণী, তুই দেখে নিস্।'

একটু চুপ করে থাকে দু'জনেই। তারপর হঠাৎ কেন যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে মরণী।

—'কি, হাসছিস্ যে বড়!' শুধায় মদন।

—'হ্যাঁ, সেই বোকা মানুষটার কথা ভেবে ভীষণ হাসি পাচ্ছে।' জবাব দিল মরণী হাসতে হাসতেই।

—'কে, চিমনলাল ত ?'

—'হ্যাঁ।'

এবার দু'জনেই একসঙ্গে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠল।

দরজার ফাঁকটুকু দিয়েই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে একছিটে আলো আর তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে চিমনলালের চোখের কোণের দু'ফোটা জল। চিক্‌চিক্ করছে, খুব আনন্দে যেন সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে জলের ফোঁটা দু'টো। আর দেরী নয়, তারও 'মহব্বতের দিল' আছে। তারও পেয়ারের 'বহু' আছে দেশে। দৌড়েই প্রায় উঠল এসে সড়কটায়। এখান থেকে সামনের জংসন ষ্টেশন মাত্র ছয় মাইল। হাঁটাপথেই পা বাড়াল সে সেইদিকে। ভেজা চোখ দুটো শুকোয়নি তখনো।

# রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা

রবীন্দ্রনাথ রায়

সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস-চর্চার রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। পূর্বতন ইতিহাস-দৃষ্টির সঙ্গে এই নবজাগ্রত ইতিহাস-চেতনার প্রভেদ আকাশপাতাল। পূর্বে ঐতিহাসিক কাহিনীর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল খ্যাতকীর্তি রাজা-বাদশাদের জীবন-চর্যা। যুদ্ধবিগ্রহ দিগ্বিজয়ের কাহিনী, শতবর্ণরঞ্জিত হ'য়ে দূরকালের একটি স্বপ্নবিভ্রমময় মরীচিকা পাঠকের বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে কুহকের সৃষ্টি করত। রাজা-বাদ্‌শার অপ্রতিহত বাহুবল ও দেশবিজয়ের নিপুণ কথা-বিস্তারে সেদিনের ঐতিহাসিকের ছিল অসাধারণ আগ্রহ। এইটুকুই ছিল সেদিনের ইতিহাস-বিস্তার নির্ধারিত পরিধি! কিন্তু ব্যক্তিগত শক্র-নিপাত কাহিনীর কথা-চতুর বর্ণনাতেই একটি দেশের ইতিহাস সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকটি বর্ণাঢ্য ঘটনার নেপথ্যে একটি বৃহৎ দেশের কত বৈচিত্র্য আছে। রাজনৈতিক জীবনের নির্বাচিত ঘটনাবলী ছাড়াও সেখানে জনসাধারণের বহু-বিচিত্র জীবনপ্রবাহ আছে, তাদের লোকায়ত জীবনকে ঘিরে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, তারও কাহিনী আছে। কিন্তু পূর্বতন ইতিহাস রচয়িতার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এই ব্যাপক রূপ ধরা পড়েনি। আধুনিক যুগে ইতিহাস-বিদ্যাকে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করার প্রয়াস চলছে। মানুষের ও মানব-সভ্যতা, সংস্কৃতির অখণ্ড প্রবহমান ধারা হিসেবেই ইতিহাসের চর্চা চ'লেছে। ইতিহাসকে তাই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত রাজা-বাদশার কীর্তি-কলাপের মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পটভূমিকার সঙ্গে অঙ্গীভূত ক'রে তার সামগ্রিক বিচার চ'লেছে। তাই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাপঞ্জী বা কয়েকটি বীরোচিত মুহূর্তের অসাধারণ বর্ণনা আজ আর ইতিহাসবিদ্যার সর্বস্ব নয়। ব্যাপক ও সর্বঙ্কর দৃষ্টিতে ইতিহাস চর্চার ফলে আজ মানুষের নানামুখী বিকাশ ও সম্প্রসারণের দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি পড়েছে। আজকের ইতিহাস তাই সেদিনের 'মিথ্যাময়ী' ইতিহাস নয়—সভ্যতার ক্রমবিকাশ, শিল্পের বিবর্তন, সমাজবিন্যাস, নৃতত্ত্ব-ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যাও তাই এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই মানবেতিহাস যত বিচিত্র ও বহুধা-বিভক্ত হোক্ না কেন, আধুনিক ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এর আভ্যন্তরীণ অখণ্ড স্বরূপটিও ধরা পড়েছে—তাই ইতিহাসের মধ্যেও যে একটি বিশেষ দর্শন আছে, তা আর আজ অস্বীকৃত নয়।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনাবলী বিশ্বভারতী একটি গ্রন্থে (১) একত্র প্রকাশ ক'রে কবির ইতিহাস-বিষয়ক মনন-সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধগুলির এই সঙ্কয়ন রবীন্দ্র-মনীষার একটি স্বল্পালোচিত দিক উদ্ঘাটিত করেছে। সঙ্কয়নটির মূল রচনাগুলির প্রথমটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর আগের লেখা হলেও, কবির ইতিহাসদৃষ্টির মৌলিকত্ব লক্ষণীয়। তখনও আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত হয়নি। প্রথম প্রবন্ধটিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন :—"দেশের

(১) ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। আড়াই টাকা।

ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবৈদ্যাগার-কাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাস-কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।"—ইংরেজকথিত ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপে ভারত ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছন্ন ক'রে সুলভ রোমাঞ্চ রচনা ক'রেছে, অনমুকরণীয় ভাষায় কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন :—"সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়।.....সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাপ-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী?"—ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় এই ভ্রান্ত পদ্ধতিই কবির মতে ভারতইতিহাসের স্বরূপধর্মটি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একদিনের অরবিকারকে যেমন স্বাভাবিক মনে করা উচিত নয়, তেমনি এ উদাহরণগুলিকেও ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বলা চলে না—এই ভ্রান্ত ইতিহাসকে কবি "ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র" নামে অভিহিত ক'রেছেন।

এর কারণও তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ইউরোপীয় ইতিহাস-বিচারের পদ্ধতি ভারত ইতিহাসের কাঁধে চাপানোর ফলেই এই বিচার-মূঢ়তার উদ্ভব হ'য়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে জাতিগত রাষ্ট্রের ইতিহাস ইউরোপীয় ইতিহাসের ভিত্তিভূমি হ'য়ে ছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনাতেও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটেছে। রাজবংশ মালা ও জয়-পরাজয়ের দলিলপত্র ছাড়াও যে ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আছে, তা ছিল ধারণার বহির্ভূত। কবি বলেছেন : "...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স্ নাই, সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।"

ভারত ইতিহাসের মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ প্রায় সূত্রাকারে সামান্য একটি মন্তব্যের মাধ্যমে বলেছেন : "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানাপথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া



তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।" পাশ্চাত্য ইতিহাসের সঙ্গে এই ঐক্যমূলক সভ্যতার মূল প্রভেদ কোথায়, তাও কবি নির্দেশ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্র-গৌরব এবং এই রাষ্ট্রগৌরব প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই পররাষ্ট্র-লোলুপতার নির্মম চক্রান্ত ইউরোপীয় ইতিহাসে নানা বিরোধের সৃষ্টি করেছে। অন্যত্র, এই প্রবন্ধ রচনার প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর পরে কবি আরও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"ইম্পীরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি ব'লেছি আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়।" (২)—"স্যাশান্যালিজম্" গ্রন্থেও কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন।

"ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধকে খানিকটা প্রথম প্রবন্ধের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে কবি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে বহু যুক্তি দিয়েছেন। ভারত ইতিহাসের কয়েকটি যুগের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রবন্ধটি নিয়ে সে সময় বহু বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবি এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর "A vision of India's History" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে কবির গবেষণা-ধর্ম ও রস-ধর্মের বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছে; ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি স্তর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন প্রভৃতি পুরাতন মহাসভ্যতার প্রারম্ভিক লগ্নে যে জাতিসংঘাত আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিপর্বে আর্য-অনার্য সংঘাতের মধ্যে কবি সেই শ্রেণীর সংঘাতকে লক্ষ্য করেছেন। রামায়ণের আখ্যায়িকা ব্যাখ্যা ক'রে কবি সেই সংঘাত ও তার পরিণতির চিত্র এঁকেছেন—আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন করেছেন তিনজন ক্ষত্রিয়—জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। কিন্তু আবার অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও প্রভেদ কম ছিল না। বশিষ্ট রামচন্দ্রের পুরোহিত হলেও জীবনের প্রথম লগ্নে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকেই যথার্থ পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন এবং সেই বিশ্বামিত্রই দীর্ঘকালব্যাপী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। আবার অন্যদিকে রামচন্দ্র জনক-রাজার হলকর্ষণজাতা কন্যা সীতাকে বিবাহ ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের পরিণয়-কাহিনীকে খুব সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনক রাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন।"—আরণ্যসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপটিকেও কবি সুপরিণত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ, শৈবরাক্ষসদের পরাস্ত ক'রে হরধনু ভঙ্গ করা, পাষাণী অহল্যার উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে আরণ্যসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের আদর্শের কথা বলেছেন। রামচন্দ্রের জীবনাদর্শের মধ্যেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, আর্য-অনার্য, অরণ্য-কৃষি সভ্যতার সমন্বয় হ'য়েছে। সংঘাত ও সমন্বয়ের এই স্বরূপের কথা 'রক্তকরবী' নাটকের

(২) শিক্ষার বাহন : কালান্তর

ভূমিকায় ও জাভাযাত্রীর পত্রে ( ৭নং ) কবি পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন। কবির এই প্রতীকাভাসের কিছু কিছু অংশ 'রক্তকরবী'র নাটকের মূল ভাবটিতে লক্ষণীয়।

এই কালের ধর্ম-কলহ ও ধর্মের সমন্বিত আদর্শের কথাও কবি উল্লেখ ক'রেছেন। মহাভারতের মধ্যেও এই সমন্বয়ের আদর্শ সুপরিস্ফুট। মহাভারতের মধ্যেও আর্য ও অনার্যের রক্তের মিলন ও ধর্মগত মিলনের নির্দেশ আছে। মনুসংহিতার মধ্যেও আর্য-অনার্য বিরোধের ভাবটি বুঝতে অসুবিধে হয় না। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের যে প্রবল প্রবাহ দু'জন রাজসন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হ'য়েছিল, তার একদিকে যেমন ছিল ঐক্য, তেমনি অন্যদিকে এর বিরোধী উপাদানও ছিল। কবি বলেছেন : "বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনো কালে করে নাই।"—বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়ে বন্যার মতো শক, হুন প্রভৃতি বিদেশী অনার্য জাতি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তার ফলে সামাজিক জীবনের ভারসাম্য অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। "ভারত ইতিহাস চর্চা" প্রবন্ধটিতে কবি আরও স্পষ্ট ক'রে ভারত ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন : "কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয় এই দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।"

গ্রন্থটিতে শিখ ও মারাঠা ইতিহাসের মূল সূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস আছে। শিখ ও মারাঠা ইতিহাস কবিকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আছে তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থে ও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে ভারত ইতিহাসের মূল নীতির কথা কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছেন। 'স্বাধীন রাণী', 'বীরগুরু', 'কাজের লোক কে' প্রভৃতি ছোট ছোট প্রবন্ধে কবি ঘটনা বিস্তারের পুনরাবৃত্তি না ক'রে ইতিহাসের মূলসূত্রকেই ধরার চেষ্টা ক'রেছেন। আধুনিক কালে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইউরোপের কোন কোন দেশের ইতিহাস আলোচিত হ'লেও প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস আলোচনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই আলোচনার কতকগুলি মূল্যবান উপাদান আমাদের সামনে রেখেছেন—এই হিসেবেও তিনি আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ডের আধুনিক ইতিহাস চিন্তার পথিকৃৎ। তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা সম্পর্কে যথার্থই বলা হ'য়েছে : "It not only helps us to look upon our past history in a refreshing new light but is also of interest as revealing the workings of a great mind applied to a great subject." (৩)

(৩) "A vision of India's History" পুস্তিকার ভূমিকা।

# সোয়েটার

## প্রকাশ পাল

মা আমার সোয়েটারটার দিকে চেয়ে বললেন, 'খোকা, ওটার কি আছে, কেন পরিস ওটা।'

সোয়েটারটা হাতে নিয়ে আমি দেখছিলুম। চারিদিকে ফুটো হয়ে গেছে। রংটাও অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে এসেছে। জামার ওপর পরলে অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়।

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন পরিস ওটা ?'

কেন পরি ? সত্যিই ত কেন পরি। মাকে জবাব দিতে পারলুম না।

জবাব দিতে পারিনি সেদিনও।

মা প্রশ্ন করেছিলেন, 'মেজ বৌমার ওপর তোর এত রাগ কেন বলত ?'

শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি।

কেন জানিনা, মেয়েটার ওপর বাস্তবিক এতটুকু সহানুভূতি ছিল না আমার। বরং একটা বেয়াড়া ধরণের আক্রোশ ছিল তার ওপর ; সব সময় মনে হত সে আমাদের সুখের সংসার নষ্ট করে দিয়েছে। সে-ই বাবার মৃত্যুর কারণ। বাবা ছিলেন বেশিরকম নিয়মনিষ্ঠ, অত্যন্ত হিসেবী। লোকে বলত বাবার প্রকৃতির সবটাই নাকি আমি পেয়েছিলুম। বাবা হয়ত সেইজন্যেই আমাকে বেশি ভালবাসতেন আর তাঁর ভালবাসা পেয়েই হোক বা যে কোন কারণেই হোক আমার মেজাজটা ছেলেবেলা থেকেই চড়া পর্দায় বাঁধা। তার ওপর খুব ছোট বেলাতেই ভায়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চাকরী পেয়ে আর বাবার মৃত্যুর পর সাংসারিক দায়িত্ব সবটুকু বহন করতে পেরে মেজাজটা অতিরিক্ত মাত্রায় চড়ে গিয়েছিল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও খাতির রেখে কথা বলতুম না। সুতরাং বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার স্পষ্ট ভাষণ অনেক সময়েই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ত।

তাই অনেকদিন পরে যেদিন মেজদাকে প্রথম মুখোমুখী পেলুম, অত্যন্ত কটুস্বরে বললুম, 'ওই ডাইনিটার জন্যে তুমি সারা সংসারটাকে জ্বালিয়ে তুললে। বাবা মারা গেলেন তোমার কাছে ঘা খেয়ে। ফের কোন মুখে সাহায্য চাইতে এসেছ ?'

মেজদা আহতস্বরে বলল, 'ছোটখোকা, তার তো কোন দোষ নেই—'

আমি আরো উষ্ণ হয়ে বললুম, 'থামো, তুমি নির্লজ্জ তাই একটা রাস্তার মেয়ের জন্যে ওকালতি করছ—'

মেজদা এবার অত্যন্ত নীচু গলায় বলল 'ছোটখোকা সে তোর বৌদি—'

দপ করে জ্বলে উঠলুম আমি। বললুম মুখভঙ্গী করে, 'বৌদি, অমন বৌদি অনেক দেখেছি। যাকে তাকে বৌদি বললে বাজারের সব মেয়েকেই বৌদি বলতে হয়—'

মা দাঁড়িয়েছিলেন কাছেই। প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, 'কাকে কি বলছিস, তোর বড় ভাই যে—'

মায়ের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আমি আমার ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

তারপর বহুদিন আর মেজদাকে দেখিনি। তবে বড়দার কাছে শুনেছি যে আমি বাড়ী না থাকলে মেজদা মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসে আর আমি বাড়ী ফেরার অনেক আগেই চলে যায়। বড়দা তার সঙ্গে কোন কথাই বলে না। হয় ত তার প্রকৃতি আমার মত নয়, আর নয়ত কাউকে কিছু বলার মত মনের জোর নির্ভর করে যে জোরের ওপর, অর্থাৎ পয়সার জোর, বড়দার নেই। সে একটা দোকানে সামান্য মাইনের চাকরি করে।

মায়ের সঙ্গে এরপর একটা মন কষাকষি হয়ে গেল। মাসকাবারি চালডাল যা কিনে দিই সেবার সেগুলো অনেক আগেই ফুরিয়ে গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার মেজছেলে রোজ আসে বুঝি?'

মা কেমন যেন থতমত খেয়ে বললেন, 'কই না।'

আমি ধমক দিয়ে বলি, 'বুড়ো হয়েছ, মিথ্যে বলতে লজ্জা করে না তোমার—?'

তারপর বলি, 'দেখ, চাল ডালের পয়সা দিনরাত খেটে উপায় করতে হয়। এটা বিলিয়ে দেবার জিনিষ নয়।'

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'ছোটখোকা, ওরা উপোস করছে। কারো চাকরি নেই। মেজখোকারও নেই, মেজ বউয়েরও নেই—'

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল বললুম, 'কার চাকরি নেই, কে কোথায় না খেয়ে মরছে তারজন্যে আমি কি আমার গতরে খাটা পয়সায় দানছত্র খুলেছি নাকি। দেখ, তোমার যদি এত দরদ সেই ছেলে বৌয়ের ওপর, যাও সেখানে, তাদের কাছে গিয়ে থাক।'

অফিস থেকে ফিরে একদিন দেখলুম সুন্দর মেয়েলি হাতে ঠিকানা লেখা একখান খাম আমার বিছানার ওপর পড়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে চিঠিটা খুললুম। দীর্ঘ চিঠি। তাতে লেখা ছিল,—

ভাই ঠাকুরপো,

জানি আমার ওপর তোমার রাগই সবচেয়ে বেশি। সবাই ক্ষমা করলেও তুমি নাকি আমায় ক্ষমা করবে না। কারণ তোমার দাদার মুখে শুনেছি তোমার ধারণা আমিই তোমার দাদাকে বাধ্য করেছি আমায় বিয়ে করতে। ঠাকুরপো, আমি তোমায় দেখিনি, শুনেছি তুমি নাকি ভারি ছেলেমানুষ। মনে হচ্ছে সত্যি তাই। ভালোবাসা কি, তুমি জান না এখনও। ভালোবাসার প্রথম আকর্ষণে মানুষের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই তোমার দাদাও যেমন আমায় বাধ্য করেনি তাকে বিয়ে করতে, আমিও বাধ্য করিনি তাকে আমায় বিয়ে করতে। দুজনের বিয়ে অতি



স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। তবুও যদি এ কৈফিয়ৎ তোমার কাছে গ্রাহ্য না হয় তাহলে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ছোটো ভাই হয়েও তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।

ঠাকুরপো, বড় দুঃখে পড়ে আজ আমি তোমায় চিঠি লিখছি। আমি অসুস্থ। তোমার দাদা আজো একটা চাকরি পেলো না। আমাদের একটি মেয়ে হয়েছে। একবছর হল তার বয়স, কিন্তু জন্মে পর্যন্ত সে ভুগছে। ভুগবে না কেন, একটা দিন একটু ভাল করে দুধটুকুও খাওয়াতে পারি নি। তুমি জানো আমি নিজে সামান্য একটা চাকরি করতুম। কিন্তু অসুখে পড়ে থাকায় সে চাকরিটুকুও গেছে। বলতে লজ্জা নেই আমাদের প্রায় ভিক্ষে করে দিন চলছে। ঠাকুরপো, আমি নিজে তোমার কাছে আশ্রয় চাইনা, তুমি শুধু এই কচি মেয়েটাকে আর তোমার দাদাকে আশ্রয় দাও। আমার দুর্ভাগ্যের দায়ে ওরাও যে মারা পড়বে নইলে। আমি কথা দিচ্ছি কোন অজুহাতেই আমি ওদের সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গিয়ে উঠব না।

তুমি আমায় ঘৃণা কর, তবু আমার আশীর্বাদ রইল।

ইতি—মেজবৌদি

গাটা শিরি করে জলে উঠল চিঠিটা পড়ে। ভাল মতলব নিয়েছে। আগেই শুনেছিলুম যে ও লেখাপড়া জানে। এখন চিঠি পড়ে মনে হল, বাংলা লেখায় মুন্সিয়ানা বেশ ভালোই রপ্ত করেছে।

কিন্তু ও চিঠিতে আমার মন এতটুকুও গলল না। বরং ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হল যে মেয়েটা পাকা খেলোয়াড়, অতি সহজেই ভালোমানুষ মেজদাকে তার বিষ্যে আর ছলাকলার জাল পেতে ধরেছে। অতএব চিঠিখানি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দিলুম।

অনেকদিন পরে অফিস থেকে ফিরে আবার দেখলুম মেজদাকে। চেহারাটা আরো শ্রীহীন। বেশ পৈশাচিক তৃপ্তি হল মনে মনে। শুধু নিজের সুখ আর ভোগের জন্য যে সংসার ছেড়েছে, মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়েছে তার এমন চেহারা না হলে কার হবে? দৃপ্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এসে বললুম, 'মেজদা, লজ্জা কি তোমার কোন কালে হবে না? ফের এসেছ?'

মা চীৎকার করে বললেন, 'ছোট খোকা—'

বললুম, 'তুমি চুপ কর দেখি মা।'

তারপর মানি ব্যাগটা প্যান্টের পকেট থেকে টেনে বার করে বললুম, 'বল, একেবারে কত পেলে তুমি রেহাই দেবে এ সংসারকে?'

মেজদা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কোনমতে বলল, 'আমি তো টাকা চাইতে আসিনি ছোটখোকা।'

'তবে কি জন্যে এসেছ?' মেয়ে-বৌকে আমাদের ঘাড়ে গছাতে?'

নিমেষে মেজদার মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ কাঁপতে লাগল। আর, হাতে যে একটা কাগজের মোড়ক ছিল সেটা মাটিতে পড়ে গেল।

'এটা আবার কি ?' মাটি থেকে তুলে কাগজ ছিঁড়তে একটা সুদৃশ্য হাতে-বোনা সোয়েটার বেরিয়ে পড়ল।

অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে। হাসতে হাসতে বললুম, 'মেয়েটা অনেক ছলাকলাই জানে দেখছি! তোমার হাত দিয়ে আবার ঘুষ পাঠিয়েছে! কিন্তু ও-সবে আমি ভুলি না।'

তারপর করলুম কি, সোয়েটারটা গোল করে পাকিয়ে উঠোনের একরাশ নোংরার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। দিয়ে মেজদার দিকে ফিরে বললুম, 'তোমার গুণবতী স্ত্রীকে খবরটি জানিও।'

'সে আর নেই।' বড়দার গলা। বড়দা বাড়ী আছে জানতুম না। কখন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তাও দেখিনি। বড়দা আবার বলল, 'মরা মানুষের শেষ ইচ্ছেকে অসম্মান করলি ?

# আলোচনা

## বাংলার শিল্প—বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন দুই প্রকার, সাকার ও নিরাকার। যাহা বাক্য দ্বারা বিজ্ঞাপিত, তাহা নিরাকার। যাহা লিখিত ও চিত্রিত, তাহাই সাকার। রেডিও সিলোন্ হইতে যে বিজ্ঞাপন আমরা শ্রবণ করি, তাহার কোন আকার নাই। অ্যামেরিকা এইরূপ বিজ্ঞাপনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কিন্তু বর্ত্তমানে টেলিভিশনের যুগে ঐ নিরাকার রূপকে আকার দান করাও সম্ভব হইয়াছে যাহাতে অর্থব্যয়ের মাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণ বর্দ্ধিত। ভারতবর্ষে অর্থের অনটন থাকিলেও বিজ্ঞাপনের অনটন নাই কারণ ইহা বিজ্ঞাপনেরই যুগ। বিজ্ঞাপনই অর্থ। এই অর্থকরী শিল্পে বাঙালী কতখানি অগ্রগামী তাহাই আলোচনা করিতেছি।

একদল বলিবেন—অ্যামেরিকা যেরূপ বিজ্ঞাপন করিতেছে, উহার নিকট তোমরা শিশু। সত্যকথা। বিজ্ঞাপনে যথেষ্ট প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। বর্ত্তমান বাংলায় যে পরিমাণ প্রতিভা আছে, তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাময়িক ক্ষেত্রে দেখা যায়না। প্রথম কারণ : যাহারা বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করে, তাহারা হয় বিজ্ঞাপন বোঝে না, না-হয় নিজেদের প্রতিভাকে বিজ্ঞাপনশিল্পীর প্রতিভা অপেক্ষা উচ্চতর মনে করিয়া ভালো জিনিষকে খারাপ ভাবে পরিচালনা করে। এই জন্যই দেশীয় সংবাদপত্রাদিতে কচিৎ কখনও ভালো বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে, যদিও বিজ্ঞাপনের ভারে সংবাদপত্রাদি নুইয়া পড়িয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সন্দেহ হয় যে ভালোমন্দ বিচার ক্ষমতা সংবাদপত্রাদির আদৌ আছে কিনা। লুণ্ঠনবস্তু যেক্ষেত্রে অর্থ, তাহা ভালোই হউক আর মন্দই হউক, সেক্ষেত্রে একেবারে অচল না হইলে সবরকম বিজ্ঞাপনই গ্রহণযোগ্য, কারণ অর্থ-সৃষ্টির নিমিত্তই বিজ্ঞাপন, যাহা না হইলে সংবাদপত্রসেবীরা দেশসেবা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব বিজ্ঞাপন আমাদের চাই-ই! বর্ত্তমানে সাকার-যুগ, বিজ্ঞাপন চিত্রিত করিবার জন্য শিল্পী প্রয়োজন, ফটোগ্রাফার প্রয়োজন, ব্লকমেকার প্রয়োজন, ছাপাখানা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এই ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট বহুলোক আছেন যাঁহাদের ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া আছে। কিন্তু এই শিল্পের উন্নতির জন্য জাতির কর্ত্তাদের দরদ মোটেই নাই। অথচ বিজ্ঞাপন না হইলে তাঁহারাও অচল।

মানুষ মাত্রেই বিজ্ঞাপন-পিপাসু। যিনি ধার্মিক, তিনি ধর্মের ভেক ধারণ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হন। যিনি কংগ্রেসকর্মী, তিনি খদ্দরের টুপি ধারণ করিয়া নিজেকে জাহির করেন। যিনি নিজেকে শক্তিমান বলিয়া মনে করেন, তিনি তাঁহার শক্তিকে বিজ্ঞাপিত করিয়া পথ চলেন। যিনি দরিদ্র, তিনি ভিক্ষুক সাজিয়া অর্থোপার্জন করেন; সর্বত্রই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপন না হইলে মানুষের একদণ্ড চলেনা। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মানুষ ভালমন্দ বিচার করে এবং সেই বিচার ফলদ্বারা চালিত হয়। অতএব বিজ্ঞাপন অত্যন্ত দামী বস্তু এবং ইহার প্রকৃত উন্নতির

জন্য আমরা সর্বদাই সচেষ্ট। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই বিজ্ঞাপনশিল্পীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহৎ। তাঁহার সর্বপ্রকার রচনা ঈশ্বরেরই বিজ্ঞাপন, যে বিজ্ঞাপন বাঙালী জাতিকে জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছে। সে বিজ্ঞাপন অ্যামেরিকান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। এদেশে ডলারের অভাব থাকিতে পারে কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। এই ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া যদি আমরা ডলারের পিছনে ধাবিত হই তবে আমাদের বালসুলভ চপলতাই বিজ্ঞাপিত হয়। বাঙালী আত্মস্থ হইলে বিজ্ঞাপন-শিল্পে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিবে, অন্য উপায় নাই।

অন্নদা মুনসী



## অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী

দিন কয়েক আগে অবনীন্দ্রনাথের একটি ( প্রায় পূর্ণাঙ্গ ) একক চিত্র প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য হলো; এর আগে আরও একবার অবনীন্দ্রনাথের কিছু ছবির একটা প্রদর্শনী দেখেছিলাম। তবে তাতে অল্প সংখ্যক ছবিই প্রদর্শিত হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় চিত্রকলার এক নূতন যুগের প্রবর্তক সে বিষয়ে কলামোদী ও চিত্ররসিকদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। যখন ভারতের নিজস্ব চিত্রকলা বলতে ( অবশ্য পট ছাড়া ) আর কিছুই ছিল না। তখন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে অনুভব করেন সে অভাব। তিনি নিজেই বলেছেন, "চিত্রাঙ্কনের জন্য আমি কোনও শিক্ষাগুরু পাই নি; কিন্তু এস্রাজ শিখেছিলাম, এক বিখ্যাত এস্রাজীর কাছে, তবু আমি একজন ভাল এস্রাজী হতে পারিনি—হয়েছি একজন চিত্রশিল্পী, এস্রাজে ছিল আমার শিক্ষা, আর শিল্পে সখ। শিক্ষা জিনিষটা বাইরের ব্যাপার আর সখ অন্তরের।" অন্তর থেকে সে অভাব অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তথাকথিত ভারতীয় চিত্রশিল্পকে সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি ও শৈলীর মাধ্যমে ভারতীয় ভাব ধারণায় প্রতিষ্ঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কনরীতি ও ভাব গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু মর্ম্মগ্রহণ করেছিলেন পটশিল্পের, অজন্তা, ইলোরার। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে ভাব ও বর্ণের সামঞ্জস্য প্রধান, কোথাও contrastএর চিহ্ন নেই ( উগ্র আধুনিকদের কাছে তাই তিনি সেকেলে )।

অবনীন্দ্রনাথের চারশো ছবিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এর মধ্যে আরব্যোপন্যাসের চিত্রগুলি আবুহোসেন, আলিবাবা। সাজাহান, জেবউন্নিসা এ ছবিগুলিতেই পাওয়া যায় তাঁর বর্ণলেপ পরিচয়, হালকা আকাশী; কমলা, পোড়া ইঁটের মত রঙের ব্যবহারে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটা স্বপ্ন রাজ্য, রঙের একটা স্নিগ্ধ শ্যামলিমা ছবিগুলোর ওপর পড়েছে। এরপর আসে তাঁর নট-নটীদের ব্যঙ্গচিত্র, মদন ও রতির চিত্র। সার্ট পরিহিত দূতের চিত্র এক করুণ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ল্যাণ্ডস্কেপে গাছপালা আকাশ এক অদ্ভুত কল্পনা নিয়ে ধরা দিয়েছে শিল্পীর তুলিতে। বিশেষ করে দুটি পাখী ও দুটি অরণ্য, যাঁরা ছবির কিছুই বোঝেন না, তাঁদেরও মনকে নিয়ে যাবে এক স্বপ্নময় অলৌকিক রাজ্যে। এর পরেই মনে ছাপ রাখার মত চিত্রগুলি পশু ও পাখী, মৃগ, মার্জার ও মোরগ। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলি, তাঁর চিত্র কাব্যময়, লিরিকধর্মী। সেই জন্যই তিনি কোথাও ব্যবহার করেননি চড়ারঙ, কোথাও নেই প্রখর বৈসাদৃশ্য—যেন সমগ্র চিত্রটিকে তিনি শ্যামলজ্জ মৌনতায় দেখতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রভারতী এতদিন পরে একটা কাজের কাজ করেছেন এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, যে কাজ অনেক আগেই করা উচিত ছিল। সে জন্য রবীন্দ্রভারতীকে ধন্যবাদ জানাই। অবনীন্দ্রনাথের তৈরী

খেলনা, যাতে তাঁর অপূর্ব গঠন-শৈলী ও কারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় সেই খেলনাগুলি প্রদর্শিত হোলনা কেন তা বোঝা গেলনা, যদিও সেগুলির প্রদর্শনের উল্লেখ আছে রবীন্দ্রভারতীর এই প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ পত্রে। বারান্তরে এগুলির একটি প্রদর্শনী করলে জনসাধারণ উপকৃত হবেন ও দেশের বিরাট প্রতিভাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে—সেই পরিচয়ই যথার্থ পরিচয়।

জনার্দন বসু

# রেডিও-নাটক-সিনেমা

## সাম্প্রতিক অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে রেডিও-নাটক-সিনেমা—আমোদ-প্রমোদ, জনশিক্ষা ও প্রচারের এই তিনটি মাধ্যমই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অপরদিকে, পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য পাঠের উৎসাহ সাধারণের মধ্যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যে-সব পাঠকসাধারণের পড়ার অভ্যাস এখনও বজায় আছে তাঁরাও চিত্রতারকাদের চিত্রশোভিত পত্রপত্রিকা কিম্বা হাল্কা গোয়েন্দাকাহিনী ও প্রেমকাহিনীই পছন্দ করেন। সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা নেহাৎই অঙ্গুলিমেয়। এর জন্য জনসাধারণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ এই অস্থিরতা ও সঙ্কটের যুগে এ-অবস্থাই স্বাভাবিক।

রেডিও-নাটক-সিনেমা, বিশেষ করে সিনেমার মাধ্যমে যে-আনন্দ জনসাধারণ লাভ করে তার জন্যে তাদের কোন বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বুদ্ধির কপাট সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেও অনায়াসে কোন একটি ছবি, নাট্যাভিনয় অথবা রেডিওর সঙ্গীত বা নাটক উপভোগ করা যায়। এবং যেহেতু অশিক্ষা এর প্রতিবন্ধক নয়, সেহেতু অশিক্ষিত জনসাধারণও এর থেকে আনন্দ পেতে পারে। তাই অর্ধশিক্ষিত, বা অশিক্ষিত লোকদের সিনেমা ও নাটকের (এবং যাত্রা) প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। রেডিওর অনুষ্ঠানসূচীতে বক্তৃতা, ক্লাসিক সঙ্গীত প্রভৃতি সবকিছুই স্থান পেলেও সাধারণ শ্রোতার কাছে কিন্তু প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে আধুনিক গানের আসর, অনুরোধের আসর ও নাট্যানুষ্ঠান। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রেডিও আজকের মত এমন ঘরে ঘরে স্থান পায়নি। রেডিও-গ্রাহক-যন্ত্র সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। সিনেমা বা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে আমাদের দেশের রেডিওর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সিনেমা ও নাট্যমঞ্চের দর্শকদের দেখা ও শোনা দুইই করতে হয়, কিন্তু রেডিও-শ্রোতার শুধু শুনলেই চলে। অবশ্য টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারে এ ব্যবধান ঘুচে যায়। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সিনেমা বা টেলিভিসনের একটা বড় তফাৎ এই যে, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রক্তমাংসের মানুষগুলো দর্শকের সামনে এসে জীবনলীলা দেখিয়ে যায়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শকরা অবলোকন করে সচল ছবির হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন খেলা। তা যদি হবে, তবে নাট্যমঞ্চের চেয়ে সিনেমায় এত বেশী ভীড় হয় কেন? জীবন্ত মানুষের চেয়ে কি ছবির মানুষের অভিনয় আমাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয়? এক কথায় এর জবাব হয় না। এর সঙ্গে অনেক-কিছু প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তবে আমার মতে প্রধান দুটি কারণে সিনেমা নাট্যমঞ্চের থেকে বেশি দর্শক আকর্ষণ করে। প্রথমত, নাটমঞ্চে প্রবেশমূল্যের হার সিনেমার তুলনায় চড়া; অথচ পিছন দিকে (কম দামের আসনে) বসে নাট্যাভিনয় যথাযথভাবে উপভোগ করা যায় না। সেদিক থেকে সিনেমায় সুবিধে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, নাটকের আর্ট সিনেমার আর্টের চেয়ে অনেক উঁচু দরের। তাছাড়া আজকাল যে-সব ছবি হয়, তাতে বাস্তব জগতের প্রতিফলন খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরন্তু একটা কাল্পনিক জগতকে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। সে কাল্পনিক জগত বাস্তবের অনুসরণে

সৃষ্টি হলে কোন কথা ছিল না। দর্শকদের সিনেমাপ্রীতির মূলও এইখানে। তাঁরা কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে বাস্তব অবস্থাকে ভুলে থাকতে পারেন অনায়াসে।

কিছুকাল আগে বাংলা দেশ থেকে পেশাদার নাট্যমঞ্চ উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল। কিন্তু এ অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জীর্ণ নাট্যমঞ্চগুলি বহু অর্থ ব্যয়ে চকচকে ঝকঝকে ও অভিনয়োপযোগী করা হয়েছে। নাটক দেখতে আজকাল আগেকার চেয়ে ভীড়ও হয় অনেক বেশী। তবু পেশাদার নাট্যমঞ্চের সাম্প্রতিক নাটকগুলি সম্পর্কে তেমন প্রশংসা-উক্তি করতে পারি না। তার প্রধান কারণ, অভিনীত নাটকের দুর্বলতা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আমি দোষ দিই না। তাঁরা প্রায়শই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেন। এইসব নাটক দেখে বেশ বোঝা যায়, লোকের মনে বিকলাঙ্গ মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি আছে, নাট্যমঞ্চের মালিকরা (নাট্যকাররাও) সেটুকুই কাজে লাগাচ্ছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, এখনকার প্রায় সব নাটকেরই কেন্দ্রীয় চরিত্রের আকৃতি বীভৎস, না-হয় কানা খোঁড়া বা বোবা।

এদিকে রেডিও হচ্ছে সরকারী ব্যাপার। প্রথমেই যে জনশিক্ষা ও প্রচারের কথা বলেছি, রেডিও-নাটক-সিনেমা, এই তিনের মাধ্যমেই এ-কাজ হতে পারে। বর্তমানে সিনেমার মারফৎ কিছুটা জনশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হলেও, রেডিও শুধু সরকারী প্রচার নিয়েই ব্যস্ত। আর সে প্রচার অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর। রেডিওর সমস্ত অনুষ্ঠানেই কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলার ভাব। সেখানে ক্লাসিক গানের এখন ঢালাও আসর চলছে, দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার রসোত্তীর্ণ নাটকগুলি এক ঘণ্টায় অভিনীত হচ্ছে, সেখানে ক্লাসিক গান ছাড়া আর সব গানেরই পাইকারী নামকরণ হয়েছে 'লঘুসঙ্গীত'।

হীরেন বসু

# সমাজসমস্যা

## রবীন্দ্রজয়ন্তী

সারা বৈশাখমাসব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তীমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি বর্তমানে বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বর্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে গেছে। সারা বছর ধরে এদেশে এত অনুষ্ঠান হয় যে অনুমান হয় পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এত প্রাচুর্য নেই।

আপাতদৃষ্টিতে এই সাংস্কৃতিক সচেতনা অনেকের কাছেই গৌরবের বলে মনে হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এই গৌরব কতখানি টিকবে সে বিষয়ে সংশয় জাগে। এই অনুষ্ঠান-উদ্যোগের পেছনে সাংস্কৃতিক সচেতনা আদৌ সক্রিয় কিনা, কিম্বা এগুলি কি পরিমাণে হুজুগ বা অসুস্থ আত্মপ্রচার-প্রবণতার অভিব্যক্তি, বিচার করার সময় আজ এসেছে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে যে অনুষ্ঠানগুলি বর্তমানে চলে, তাদের স্বরূপ কি? কয়েকটা গান, নাচ আর আবৃত্তি, একটা নাটক বা নৃত্যনাট্য এবং সূচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর এক বা একাধিক গতানুগতিক বক্তৃতা—যা নেহাৎ না থাকলে বুঝি ভাল দেখায় না, কিন্তু তা যে একান্ত অনাকাঙ্খিত এ বিষয়ে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়পক্ষই একমত (একথা বোঝা যায় বক্তার জবাবদিহিতে আর শ্রোতার অধৈর্যে)। এই হল অনুষ্ঠানের চেহারা। এই গান বা কবিতাগুলি যে উদ্যোক্তা বা পরিবেশকের কাছে কোন গুণগত স্বীকৃতির ফলে পরিবেশিত হয় একথা মানতে আমরা রাজি নই। নিতান্তই রবীন্দ্রজয়ন্তী,—আর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা গান আর কবিতাও যখন লিখে গিয়েছেন, তখন রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁর গান বা কবিতাই পরিবেশন করা উচিত। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ফরমায়েস অনুযায়ী দু-একটা ফিল্মীগানা বা তথাকথিত আধুনিক গানও কোথাও কোথাও পরিবেশিত হ'তে আমরা শুনেছি।

অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও কি খুব সাংস্কৃতিক সচেতনার পরিচয় দিয়ে থাকেন? গান শুনতে সবাই ভালবাসেন। পাড়ায় জলসা (হিন্দী 'তামাশা' শব্দটি এখানে ঠিক খাটে) হচ্ছে, যাই শুনে আসি—এই মনোভাব কি অধিকাংশ শ্রোতার মনে প্রধান না? রবীন্দ্রসঙ্গীত বা সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন appreciation নিয়ে কজন শ্রোতা এই জলসাগুলিতে আসেন?

উদ্যোক্তা কারা? রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা পাড়ার সব অনুষ্ঠানেরই সরকারী উদ্যোক্তা—পাড়ার দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা থেকে সুরু করে রাজকাপুর-সম্বর্ধনা সভার আয়োজন এরাই করে থাকে। মোড়ের চায়ের দোকানে এদের একাংশের উপস্থিতি অত্যন্ত অপ্রীতিকরভাবেই পাড়ার মহিলারা অনুভব করেন।

এই যদি অবস্থা হয় তবে সংস্কৃতি সচেতনতা কোথায়?

বরঞ্চ মনে হয় রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলি বর্তমান বাংলার সর্বব্যাপী হুজুগপ্রিয়তারই আর একটি অসুস্থ প্রকাশ। যে হুজুগের আতিশয্যে আমরা মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখার জন্য

তিনদিন আগে থেকেই 'কিউ'তে দাঁড়াই, যে হুজুগে আমরা নতুন ফিল্মের ( বিশেষত হিন্দী ছবি ) উদ্বোধনীতে নায়ক বা নায়িকাকে সশরীরে দেখবার জন্য প্রেক্ষাগৃহের সামনে রাস্তায় ভিড় করে 'জাম্' করে দিই, যে হুজুগে 'লারে-লাপ্পা' গানের একান্ত অনুরাগী ভক্তরা সারারাত হিমেল ফুটপাথের উপর বসে ( বা শুয়ে ) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনার নাম করে ঝিমোন, সেই হুজুগেই আমরা আজকাল রবীন্দ্র জয়ন্তী তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মাতামাতি করছি। আত্মপ্রচারও ( উদ্যোক্তাদের পক্ষে প্রযোজ্য,—এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রোতাদের চেয়ে উদ্যোক্তাদেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায় ) যে এই অনুষ্ঠানগুলির পেছনে একটা প্রধান প্রেরণা সে বিষয়েও বোধহয় অনেকেই একমত হবেন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্বন্ধে উপরোক্ত সমালোচনার পর হয়ত উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আর যাই হোক সাংস্কৃতিক সমস্যার 'দাওয়াই' চলে না। যা প্রয়োজন তা' হল পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনা। রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে সাংস্কৃতিক চাহিদা দেখা দেয় তা' স্বভাবতই এইসব অনুষ্ঠানাদির গতিপ্রকৃতি নির্দ্ধারণ করবে। সেই সঙ্গে পথিকৃৎদেরও একটা সুনিশ্চিত role আছে। সেইখানেই প্রয়োজন সচেতনতার। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও ২, স্যাইরড্ স লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।